বিহার অনুসন্ধান গ্রন্থাবলী—২নং

চণ্ডীদাস।

"চণ্ডীদাস গাহিল গান।"

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

'বৈদ্যনাথ-কথা' প্রণেতা

শ্রীকরালী কিঙ্কর সিংহ, বিদ্যাবিনোদ

প্রকাশক

মজুমদার, সিংহ এণ্ড কোং

বৈদ্যনাথ—দেওঘর।

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য ৮০ আনা মাত্র।
ঐ ১৷০ বাঁধাই।

চিত্রকর—শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ।

শিল্পী—শ্রীপ্রিয় গোপাল দাস।

মুদ্রাকর—শ্রীশশধর ঘোষ, 'তারা প্রেস'।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

মা,

জীবনের প্রভাতে, তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া,
যে সব কথা শুনিয়াছিলাম,
সেই গুলি, জীবনের মধ্য-
ভাগে যুক্তি ও তর্ক দ্বারা
সাজাইয়া তোমার
শ্রীচরণে উপস্থিত
হইয়াছি।



বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের

চণ্ডীদাস

(সচিত্র উৎকৃষ্ট অভিনব সংস্করণ)

দ্বিতীয় খণ্ড

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মূল্য ৸৹ আনা।

লেখকের নিবেদন।

প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে, আমার ইহলোকের প্রত্যক্ষ দেবী, আমার পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী কলিকাতা হইতে "চণ্ডীদাসের পদাবলী" আনিবার জন্য আদেশ করেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম "চণ্ডীদাস" বটতলা ও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের আশ্রয়ে অতি গোপনে আত্মরক্ষা করিতেছেন। কেবল রমণী বাবুর সংস্করণটী একমাত্র সম্বল, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও একটী নব সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হইল। আমি সাগ্রহে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। সংগ্রহ কার্য্য শেষ হইলে 'সাহিত্য প্রচার সমিতি' আমার চণ্ডীদাস প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলেন। এমন কি ৩ খানা ছবি (Block) ও ১ম ফর্ম্মা কম্পোজ (compose) পর্য্যন্ত হইয়া গেল। তারপর প্রায় ২ বৎসরের নিস্তব্ধতার পর আমি প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্সকে প্রকাশের ভার অর্পণ করি। পুস্তক ছাপা হইবে এমন সময় সংবাদ পাইলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে চণ্ডীদাস প্রকাশিত হইতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বলিলেন যে ৪।৫ টাকা মূল্যের পুস্তক বিক্রয় হওয়া এদেশে কঠিন। কাজেই যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। কিন্তু অনেক দিন পরে মনে হইল যে বঙ্গের আদি কবি চণ্ডীদাসের ২টা ভাল

সংস্করণ কি বড় বেশী? তাই আমার সঙ্কলিত চণ্ডীদাসের ভূমিকার এ অংশ হইতে বর্ত্তমান চণ্ডীদাস ১ম খণ্ডের জন্ম।

আমি যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদির মত গ্রহণ করিয়াছি তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি; আমি এই সকল পুস্তক ও পত্রিকাদির লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞ। সুকবি, শিশু-সাহিত্যে সম্রাট বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় চণ্ডীদাসের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ মহাশয় পত্র দ্বারা আমায় এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। উদীয়মান চিত্রকর আমার সহোদর তুল্য শ্রীমান সতীশচন্দ্র সিংহ চণ্ডীদাসের ছবি কয়টী অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। 'নায়ক' সংবাদপত্রের অন্যতম স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের ছাপার সকল ভার গ্রহণ করিয়া আমার ভার অনেক লাঘব করিয়াছেন। বীরভূমের অন্তর্গত পরোটা গ্রাম নিবাসী আমার মাতুল স্থানীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ত্বদীয় পিতামহদ্বারা সংগৃহীত চণ্ডীদাসের পদগুলি আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার জন্য দিয়াছিলেন। আমার স্বগ্রাম নিবাসী আমার জ্যেষ্ঠতুল্য শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আমার সংগ্রহ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি ইঁহাদের সকলের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি ও সাধারণতঃ কলিকাতা হইতে

দূরে বাস করি বলিয়া নিজে ছাপার কার্য্য দেখিতে পাই নাই। কাজেই কয়েকটী মুদ্রাকর প্রমাদ অসংশোধিত অবস্থায় আছে। সহৃদয় পাঠক সেগুলি মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব। ইতি—বৈশাখ, ১৩২৭।

চণ্ডীদাস।

উপক্রমণিকা।

—:০।০:—

দেশের ও ধর্ম্মের অবস্থা।

চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শুভক্ষণে বঙ্গ-কবি-চূড়ামণি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে তোগলক বংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এই বংশের মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে ১৩৪০ খৃঃ সুবর্ণ-গ্রামের মুসলমান শাসনকর্ত্তা ফকিরুদ্দিন দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও আদি উদ্দিন আলি সা পশ্চিম বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পরে ইলিয়াস সাহী বংশের সামসুদ্দিনের চেষ্টায় পরিপুষ্ট রাজশক্তি ১৩৪৫ খৃঃ পশ্চিম বঙ্গ ও ১৩৫২ খৃঃ পূর্ব্ব বঙ্গ অধিকার করিয়া বঙ্গদেশে চক্রবর্ত্তিত্ব করিতেছিল। সে সময়ে বারাণসী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বিস্তৃত হইয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে ফিরোজ সা অধিরোহণ করিয়া, বাঙ্গালা আবার দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য, সামসুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি আসিয়া পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। পাণ্ডুয়া হইতে ১১ মাইল দূরে একদলা দুর্গে সামসুদ্দিন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ সাহা একদলা

অধিকার করিতে না পারিয়া ১৩৫৩ খৃঃ সন্ধি করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। পরে ১৩৫৭ খৃঃ তিনি বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। বহু দিন পরে সমস্ত বঙ্গ দেশ আবার এক রাজার অধীনে আসিল।

ইহার পরে আর দিল্লীর বাদসাহেরা বাঙ্গালার প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। বিশেষতঃ ১৩৯৮ খৃঃ তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীর রাজশক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন শক্তি একত্র করিয়া ১৪১৪ খৃঃ যদিও সৈয়দ বংশ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তৈমুরের আক্রমণের বেগ সহ্য করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-গৌরব আনয়ন করিতে বহুদিন গিয়াছিল।

সামসুদ্দিনের পরে সেকন্দর সা ১৩৫৮-৮৯, গায়স উদ্দিন ১৩৮৯-৯৮, সৈফ উদ্দিন হামজাসা ১৩৯৮-১৪০২ ও সামসুদ্দিন ১৪০২-৫ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। ইলিয়াস সাহী বংশের অবসানে বহু দিন পরে সেই ইতিহাস-বিখ্যাত লক্ষণাবতীতে (পাণ্ডুয়া)—সেই শেষ হিন্দু নরপতিদের রাজধানীতে, সেই লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনে আবার হিন্দু রাজা স্থান পাইলেন। দিনাজপুরের রাজা গণেশ * ১৪০৪ খৃঃ সামসুদ্দিনের পরে বাঙ্গালার অধিপতি হন। †

রাজা গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অনেক হিন্দুমন্দির স্থাপন

* শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে ভাতুড়িয়ার জমিদার।

† "মুসলমান শাসন সময়ে একবার এক হিন্দুরাজা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া, গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইতিহাস বিমুখ বঙ্গদেশে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে দেশে কবিকল্পনা লক্ষ্মণ সেনের কাল্পনিক পলায়ন কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিতে লালায়িত হইয়াছে, সে দেশের সাহিত্যে এই হিন্দুনরপতি অদ্যাপি কবি কুলের নিকট

করেন। এই সব মন্দিরের উপকরণ লইয়া পরবর্ত্তী মুসলমান রাজারা মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের প্রিয় পাত্র হইয়া ইনি দশ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।*

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যদু বা জাঠমল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালাল উদ্দীন নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ১৪১৪ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পাণ্ডুয়া হইতে গৌড় নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইঁহাদের বংশাবলী ১৪৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরে আর কোন হিন্দু নরপতি বাঙ্গালার রাজা হন নাই।

তৎকালে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার নরপতিগণ বঙ্গদেশের সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। ইঁহাদের অধীন ছোট ছোট রাজা ও জমীদারবর্গই দেশ শাসন করিতেন ও যথা সময়ে স্বীয় দেয় কর রাজসমীপে পাঠাইয়া দিতেন। সময়ে সময়ে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে বিপ্লব কালে পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে আগত বীরগণ বঙ্গদেশে আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিতেন; এইরূপে স্মরণাতীত কালে বীর সিংহের স্থাপিত বীরসিংহপুর, চৈতন্য সিংহের স্থাপিত চৈতন্যপুর, ফতে

সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথা কেবল মুসলমান লিখিত ইতিহাসেই নীরবে কীট দষ্ট হইতেছে।"

প্রবাসী—শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

He reigned for 10 years, making Pandua his Capital, and his popularity with his Mahomedan subjects shows him to have been a sensible and tolerant ruler

—Ravenshaw's Gour Page 99.

সিংহের স্থাপিত ফতেপুর প্রদেশের কথা শুনিতে পাওয়াযায়। হণ্টার সাহেবের মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বীর সিংহ বঙ্গদেশে আগমন করেন ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় নামে নূতন নগর স্থাপন করেন। বীর সিংহ স্বীয় রাজধানীতে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পাষাণময়ী এক কালী মূর্ত্তি স্থাপন করেন ও বীরসিংহ পুরের নিকটে পুরাণ বর্ণিত বৃন্দাবনের অনুকরণে বৃন্দাবন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহপুরে বীরসিংহের স্থাপিত মা'র মন্দির, তাঁহার প্রস্তুত কুঞ্জাবলী, তাঁহার অভেদ্য দুর্গ, উচ্চ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের নিদর্শন অদ্যাপি সিউড়ীর (বীরভূমের) ছয় মাইল পশ্চিমে স্বস্থানে আত্মরক্ষা করিতেছে।

বীরভূমের প্রথম হিন্দু নরপতি বীরসিংহ মুসলমান সমরে প্রাণ ত্যাগ করেন। তদীয় যোগ্যা মহিষী যবন হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে স্বীয় সতী-ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত এক পুষ্করিণী-বক্ষে জীবন বিসর্জ্জন করেন। সতী-দেহ স্পর্শে পবিত্র পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, লোকে ইহাকে 'রাণীদহ' বলে। এই হিন্দুরাজদম্পতির তিরোভাবের পর বীরভূমির ইতিহাসে আর কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বীরভূম কাহার অধীন ছিল বলা যায় না।

এই সময়ে বঙ্গদেশের ধর্ম্মের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, ৭ম খৃঃ অসাধারণ প্রতিভাবলে শঙ্করাচার্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রগাঢ় চিন্তাপ্রসূত ধর্ম্ম, সাধারণের উপযুক্ত নহে—তাই তিনি মহাযোগী বুদ্ধের পরিবর্ত্তে মহাযোগী শিবকে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। প্রাণিবধ উভয় মতে মহাপাপ ; সহজেই বৌদ্ধমতের পরিবর্ত্তে শৈব মত প্রচলিত হইল।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয়। আর্য্যোপনিবেশে আর্যসমাজের ও ধর্ম্মের সমুদয় বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কাজেই বৌদ্ধধর্ম্ম লব্ধপ্রসর হইয়াছিল। ৭ম খৃঃ হুয়েনৎসাং তীর্থ দর্শনাভিলাষে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সম প্রভাবে বর্ত্তমান ছিল। সে সময়ে কাশ্মীর, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনী আবার হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন:—"* * * রাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম উভয়েই প্রচলিত; ত্রিশটী সঙ্ঘরামে প্রায় ২ হাজার ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, রাজ্যে প্রায় একশত দেব-মন্দির আছে * * *।" পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে আমরা বঙ্গদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব দেখিতে পাই।* যাহা হউক আমরা অষ্টম খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দেখিতে পাই যে বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলিতেছে।

ধর্ম্মপাল (৭৮৫ খৃঃ-৮৩০ খৃঃ) গঙ্গার বামতীরে পর্ব্বতোপরি বিক্রমশীলা (বর্ত্তমান সুলতানগঞ্জ) বিহার স্থাপন করেন, আবার গয়ায় মহাবোধি তরুর নিকটে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর মহীপাল দেবকে (৯৮০ খৃঃ—১০৩৬ খৃঃ) আমরা বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে হিন্দু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতে দেখিতে পাই।

এদিকে বৌদ্ধ প্রচারকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি কালে প্রচারের উন্নতির জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। বড় বড় মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া ও উৎসবাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা

* ৭৩২ খৃঃ আদিশূর বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন

করেন। এই সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণগণকে আমরা ঐ সব মন্দিরের ভার গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তীকালে—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণগণ বহুপূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত হোমার্থ অগ্নিস্থান বিদায় দিয়া বৌদ্ধ দেবালয় গুলিকে আপনার করিয়া লন।*

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে আপনার প্রকৃতিতে এরূপভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল যে বৌদ্ধধর্ম্মের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে নিজস্ব করিয়া লইয়া উচ্চ আসন দিয়া, অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই

"দেখিলে সিংহাসনোপরে
বিজয় বউদ্ধরূপরে।
পদ অঙ্গুলি নাহি হাত
শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥"

দারুব্রহ্ম ৫ম অ ৩২।৩৩

---

* বৌদ্ধোৎসবগুলি হিন্দু উৎসবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। রথযাত্রা, দীপালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পূর্ব্বে বৌদ্ধোৎসব ছিল, উহা এই সময়ে হিন্দু উৎসব হইয়া যায়। চৈত্র মাসে চড়ক পূজার সঙ্গে যে নীল পূজা আছে, এ দেশের স্ত্রীলোকেরা যে নীলাবতীর ব্রত করেন, তাহা বৌদ্ধানুষ্ঠান। নীল পূজার দ্রব্য সামগ্রী অনেক সময়ে ডোমেরা পায়। * * * উত্তর রাঢ়ে গ্রামে গ্রামে যে ধর্ম্মপূজা হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধদেবের প্রচ্ছন্ন উৎসব। বুদ্ধদেব পশ্চিম বাঙ্গালায় ধর্ম্ম নামে পূজা পাইতেছেন। উসৎপুর, চাপাই ও হাকন্দ নগরে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্ম নামে পূজিত হন। * * রাঢ় দেশের বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বাঁকুড়ায় শ্যামরায় ও ভৈরব নামে হিন্দুদেব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নেপালের বৌদ্ধ হারীতী দেবী বঙ্গদেশে শীতলা হইয়াছেন।

গৌড়ের ইতিহাস ১৫৩ পৃঃ

হিন্দুর পূজ্য—প্রধান তীর্থ স্থান। তাই আমরা কশীর পার্শ্বেই সারনাথ দেখিতে পাই—গয়া হিন্দু ও বৌদ্ধের প্রধান তীর্থ।

একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে :—"বুদ্ধদেব নিজ ধর্ম্মের রক্ষার ভার প্রথমে শিবকে দেন; শিব অপারক হইলে চামুণ্ডাকে দেন।" ইহাতে বোধ হইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির দিনে প্রথমে শৈব ও পরে তান্ত্রিক মত প্রচলিত হইয়াছিল; বঙ্গে তান্ত্রিক মতই লব্ধ-প্রসর হইয়াছিল।

বল্লাল সেনের পূর্ব্বেই হিন্দু ও বৌদ্ধ এক হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার (১১১৯ খৃঃ—১১৬৯ খৃ) সময়ে তান্ত্রিক মতের সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়দের পূর্ব্বের ন্যায় আর গৌরব ছিল না। তন্ত্রের নববিধ আচার লক্ষ্য করিয়াই বল্লালসেন-সৃষ্ট কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত হয়। তখন "রাজধানীতে প্রকাণ্ড রাজপথ, বারবিলাসিনী দিগের মঞ্জীর নিক্কণে চমকিত। নিশীথে স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারি-কাগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত। প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমা-লাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্‌ভ্রান্ত।" *

লক্ষণ সেনের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশ যবন শাসনাধীন হইল। পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও রাজশাসনে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, মান, এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-যাজক ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। ব্রাহ্মণের দাস শূদ্র, কৃষক বৈশ্য, চিকিৎসক বৈদ্য, রক্ষক ক্ষত্রিয়; এইরূপে ব্রাহ্মণগণ সাধারণকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কাজেই রাজ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজবল দূর হইলে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য

* লক্ষণ সেনের রাজধানীর বর্ণনা করিয়া কুবলয়বতী পবনকে বলিতেছে :

লোপ পাইতে বসিল—আপনা হইতে নিগড় ভাঙ্গিতে লাগিল ; কাজেই যবনের বিলাসপ্রিয়তা, সুখলিপ্সা ও ব্যভিচার সাধারণকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তাই বঙ্গদেশে অপ্রতিহত প্রবাহে তন্ত্রের প্রচার সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দুর্বৃত্তেরা তন্ত্রের পঞ্চমকারের দোহাই দিয়া সমাজের চক্ষে ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছ অধর্ম্ম সাধন করিত। বিশেষতঃ বীরভূমের পীঠস্থান বক্রেশ্বর, অট্টহাস, লাভপুর, তারাপুর, নলহাটী প্রভৃতি স্থানে মদ্য-মাংসই দেবীর অর্চনার প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিল। এ দিকে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নূতন নূতন দেব-দেবীর আবির্ভাব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশের মনসা, শীতলা, কার্ত্তিকেয় ও তাঁহার শক্তি ষষ্ঠী, মঙ্গল চণ্ডী, বিশালাক্ষী বা বাশুলী, শুভচণ্ডী (সুবচনী), গজলক্ষ্মীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বঙ্গে এই প্রাণ-হীন, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম-প্রক্রিয়ার দিনে দুঃখিতের শান্তি ছিল না—তাই বাঙ্গালীর দুর্দ্দিনের কবি চণ্ডীদাসের প্রেম আধ্যাত্মিক—কারণ দুর্দ্দিনে অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করে।

বঙ্গদেশের সংস্কারের যুগে চণ্ডীদাস একজন সংস্কারক রূপে জন্মগ্রহণ করেন—কারণ সে যুগ তাঁহার উপযুক্ত ছিল, সে যুগ তাঁহার অভাব বোধ করিয়াছিল এবং সে যুগ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল।

এ জগতে আমূল পরিবর্ত্তন অসম্ভব। চণ্ডীদাস তাহা জানিতেন. তাই তিনি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া সংস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই তিনি প্রচলিত ধর্ম্মকে ধীরে ধীরে উচ্চতম আদর্শের অনুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মে বহু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই দুই ধর্ম্মে

কোন পার্থক্য নাই। কেবল নামের পরিবর্তন ও কতকগুলি নূতন অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

পুরুষ হরি ও পুরুষ হর এক—যিনি হরি তিনিই হর। শাস্ত্র-গ্রন্থের শ্লোকেই যে ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে তাহা নহে, উভয়ের একত্র যোগে এক নবরূপ সৃষ্ট হইয়া নবমূর্ত্তিতে 'হরিহর' রূপে হিন্দুর নিকট পূজ্য ও নমস্য। "ব্রহ্মা ভব হইতে ভিন্ন নহেন—শম্ভু তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহেন। আমিও তোমাদের উভয় হইতে ভিন্ন নহি। আমাদের অভেদ ভাব নিত্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের একত্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম কর! মস্তক গ্রীবাদিভেদে অঙ্গ সকল যেমন একজনেরই হইয়া থাকে তদ্রূপ হে হর! আমারি একেরই এই তিন ভাগ!"*

প্রকৃতি রাধা ও প্রকৃতি কালী (গৌরী অথবা দুর্গা) এক। তাই আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখিতে পাই:—শঙ্করং প্রতি পার্ব্বতী বাক্যম্—"বৈকুণ্ঠেঽহং মহালক্ষ্মী গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্।"

অন্যত্র

কৃষ্ণং প্রতি পার্ব্বতীবাক্যম্—"একাহং রাধিকারূপে গোলোকে রাস মণ্ডলে।"

* "ন ব্রহ্মা ভবতোভিন্ন ন শম্ভু ব্রহ্মণ স্তথা।
ন চাহং যুবয়োর্ভিন্নোহ্য ভিন্নত্বং সনাতনম্।
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ শম্ভুনাং জ্ঞাতাং কুরু।
শিরোস্ গ্রীবাদিভেদেন যথৈবৈকস্য ধর্ম্মিণঃ॥

কালিকা পুরাণ ১১শ অঃ

তন্ত্রেও এ সম্বন্ধে লিখিত আছেঃ—

"স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্থ ভগবান্ স্বয়ম্।
স্বয়ঞ্চ ভগবান্ কৃষ্ণ কালী রূপো ভবেৎ বঙ্গে॥"

মুণ্ডমালা তন্ত্রম্।

তন্ত্রের অষ্ট নায়িকা ও ৬৪ যোগিনী বৈষ্ণবের অষ্ট সখী ও ৬৪ উপসখী হইয়াছেন।

সে সময়ে শক্তির কাল পড়িয়াছিল। সাধারণে শক্তি বিহীন ধর্ম্মের কথায় আস্থা স্থাপন করিত না। তাই বঙ্গে ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য মধুর শক্তি বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি দ্বারা উপ্ত হইয়া দয়ার ঠাকুর চৈতন্যদেব দ্বারা প্রচারিত হইয়া বঙ্গের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

এইবার আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে তদ্‌কালীন সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিব। আমাদের দেশে পুরাতন সাহিত্যের একটা প্রকৃতি—একটা ধর্ম্ম ছিল। পুরুষ-পরম্পরায় অর্জ্জিত ও জন্মগত সংস্কার বশে বঙ্গ কবির সৃষ্ট সাহিত্যে সমাজের ও জাতির, দোষ ও গুণ, রুচি ও প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; তাই বঙ্গ সাহিত্য বাঙ্গালীর চরিত্র ও প্রকৃতির শাব্দিক বিকাশ মাত্র—তাই চণ্ডীদাস আলোচনা করিলে আমরা সৌরভ-গৌরব-পরিপূরিত পূর্ব্ব কালের সুখ-দুঃখে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে, আনন্দ-উৎসবে ভরা বাঙ্গালীর সংসারের দৃশ্য দেখিতে পাই—তাই আমাদের চক্ষে চণ্ডীদাসের চিত্র প্রকৃত উজ্জ্বল দৃশ্যপট।

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের পদে

আলতা, সিঁথায় সিন্দুর, নয়নে কাজল শোভা পাইত। কানড়া ছাঁদে (কুণ্ডলিত সর্পাকারে) কবরী বাঁধা তখনকার প্রথা ছিল। নাসায় ফুল, বেশর ও মুক্তা শোভিত নথ, কর্ণে কর্ণবালা ও ঢেড়ি, পদে মল্লতাড়ল (মল) ও হৃদয়ে মণিময় হার স্ত্রী অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত। সে কালে স্ত্রীলোকেরা কাঁচুলি ব্যবহার করিত ও নীল সাড়ী পরিয়া 'বাহার' দিত। চুয়া, চন্দন, কস্তুরী, কেশর, খস খস, কর্পূর ও আমলকী বর্ত্তমান কালের এসেন্স ও গন্ধ তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।

চণ্ডীদাসের সময়ে হাট ও বাজারে কড়ি ব্যবহৃত হইত। সে কালে ব্যবসায়িগণ গ্রামে গ্রামে মুক্তা, প্রবাল, হীরা, দর্পণ, সুঁচ, দ্রাবক সোহাগা চুয়া, চন্দন, কস্তুরী, কেশর, কর্পূর, বেণার মূল, আমলকী ইত্যাদি লইয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইত।

সে কালেও গ্রহবিপ্রের দল পঞ্জিকা লইয়া গৃহে গৃহে ফলাফল বিচার করিয়া বেড়াইতেন। বাজীকর দুইটী গোলক ফেলিয়া দিয়া বুকের উপর ধরিত, মুখের ভিতর হইতে রাশি রাশি মুক্তা প্রবালাদি বাহির করিত ও বংশ দণ্ডের উপর নানা প্রকার খেলা দেখাইত। বেদেরা সাপ খেলাইয়া সকলকে আনন্দিত করিত। নাপিত বৌ বামাগণের পদযুগল আলতা দিয়া নানা প্রকারে চিত্রিত করিয়া দিত। মালিনী ফুলের সাজি হস্তে ফুল যোগাইত। দেয়াশিনী সকলকে আশীর্ব্বাদ পুষ্প দিতেন।

তখন গোলাপের জন্ম হয় নাই; মালতী, মল্লিকা, যাতি, যূথী ও নব-মল্লিকার আদর বেশী ছিল। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে 'জিলেফি মালপো কচোরি, আলফা, পুরি, খিরি, চিনি, কলা, ও সীতামিশ্রই উপাদেয় সামগ্রী ছিল।

আজ কাল আমরা নানা দেশের সাহিত্য হইতে নানা ভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছি বলিয়া গৌরব করি—তাই বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে পাশ্চাত্যের চিত্র দেখিতে পাই, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলী যজ্ঞ-হবির মত পবিত্র; উহা কেবল আমাদিগকে আমাদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

চণ্ডীদাসের জীবনী

—০ঃ*ঃ০—

যেখানে পর্ব্বত দুহিতা ক্ষীণকায়া অজয়ের স্রোত আসিয়া পূত-প্রবাহিনী ভাগিরথীর স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার নিকটে অপর তটে—কণ্টক নগরী। প্রাচীন কণ্টক অথবা কাঞ্চন (বর্ত্তমান কাটোয়া) নগরী জগতের শ্রেষ্ঠ ভক্তদিগের পদ-রেণু-স্পর্শে ভারতীয় প্রেম-ভক্তির পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ। লীলাবতার মহাপ্রভু চৈতন্য-দেব এখানে কেশব ভারতীর আশ্রমে সন্ন্যাসধর্ম্ম ও কৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ করেন। আবার কণ্টক নগরীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে একদিন চণ্ডীদাস, কাশীরাম দাস, কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী, জ্ঞানদাস, নরহরি ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্য গঠন করিয়াছিলেন। * বঙ্গ ভাষার জননী বলিয়া কাটোয়ার বঙ্গবাসীর সম্মান লাভ করিবার যথেষ্ট অধিকার আছে।

---

* নান্নুরে চণ্ডীদাস, সিঙ্গিতে কাশীরাম দাস, ঝামটপুরে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী, কান্দরায় জ্ঞানদাস, শ্রীখণ্ডে গোবিন্দ দাস ও নরহরি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। কবিরাজ গোস্বামী, উদ্ধারণ দত্ত ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের পবিত্র অস্থি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অদ্যাপি ঝামটপুর, উদ্ধারণপুর ও জাজগ্রাম ভক্ত বৈষ্ণবদিগের পরম পবিত্র তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন কাটোয়া হইতে ৮ ক্রোশ পশ্চিমে বর্ত্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। *

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটিরে
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি॥"

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই নান্নুর গ্রামের প্রান্তে পবিত্র পত্রের কুটীরে বসিয়া চণ্ডীদাস যে মধুর প্রেম সঙ্গীত কোকিল কণ্ঠে পঞ্চম তানে গাহিয়াছিলেন, আজও প্রতিনিয়ত তাহার প্রতিধ্বনি বঙ্গ গগনের দূরদূরান্তে উঠিতেছে। *

---

* চণ্ডীদাসের বাশুলীর বর্ত্তমান পূজক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমরা চণ্ডীদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলেন "বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। চণ্ডীদাস পরিব্রাজক ছিলেন, ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসেন ও এই দেবীমন্দিরে সিদ্ধ হন।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থনের জন্য প্রমাণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন "আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাই শুনিয়া আসিতেছি।" কেবল পূজকের কথার উপর নির্ভর করিয়াই চণ্ডীদাসের বাড়ী বাঁকুড়া জেলায় বলা যায় না। সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটী হইতে উক্ত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"শালতোড়া গ্রাম অতি পিঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্য সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥"

* নান্নুর যাইতে হইলে ম্যাকলয়েড কোংর কাটোয়া আমদপুর লাইনস্থ কির্ণাহার

এই স্থানে—এই নান্নুর গ্রামে—প্রেমিক চণ্ডীদাস কবিকুলতিলক জয়দেব সৃষ্ট প্রেম-প্রবাহের প্রবাহপথ সুবিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন; সেই অমৃতধারা পান করিয়া শত-সহস্র বঙ্গবাসীর জীবন ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর চিরআদরের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ১৩০৯ সালের শ্রাবণ মাসের "বীরভূমি" পত্রিকায় "চণ্ডীদাসের জন্মস্থান কোথায় ছিল?" প্রবন্ধের লেখক মহাশয় বলেন, "একজন মিথিলা দেশবাসী পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে কির্ণাহারে আসিয়া থাকেন। তিনি বলেন, চণ্ডীদাস মিথিলাবাসী ছিলেন। মজঃফরপুর জেলায় উচৈচট গ্রাম তাঁহার জন্ম-স্থান ছিল।" মিথিলাবাসী পণ্ডিতের উক্তি গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। চণ্ডীদাস যদি প্রকৃতই মিথিলা বাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির সমন্ধে কোননা কোন উল্লেখ তাঁহার কবিতার মধ্যে নিশ্চয়ই থাকিত। বিশেষতঃ তাঁহার পদাবলী হইতে আমরা তাঁহার সকল কথাই জানিতে পারি; কিন্তু ইহার কুত্রাপি মিথিলার নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে কি করিয়া বলা যায় যে চণ্ডীদাস মিথিলাবাসী ছিলেন? অধিকন্তু আমরা উচৈচট গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, তথায় উক্ত নামের একজন কবি ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে আমাদের নান্নুরের কবি তৎসমন্ধে কোন প্রমাণ নাই। এরূপ স্থলে প্রকৃত প্রমাণ থাকা

ষ্টেসনে নামিয়া ৩ মাইল দক্ষিণে যাইতে হয়। পূর্ব্বে বাশুলীর মন্দিরের নৈঋত কোণে অনতিদূরে নান্নুর গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান সময়ে গ্রামের মধ্যে মন্দির দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে স্থানে গ্রাম ছিল তথায় কর্ষণ কালে অদ্যাপি অনেক পুরাতন জিনিষ পাওয়া যায়। শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অশোকেরসময়ের মোহর ও ২টী চুল্লী পাইয়াছেন।

সত্ত্বেও একজন মিথিলাবাসীর কথায় আমরা চণ্ডীদাসকে ত্যাগ করিব কেন?

চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কালের কোন নির্দ্দিষ্ট সন বা শকাব্দ পাওয়া যায় না। তাঁহার জন্মকাল নির্ণয় করিতে যাইয়া নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল মহাশয়ের মতে ১৩০৫ শক (১৩৮৬ খৃঃ), বসুমতীর প্রকাশিত সংস্করণে ১৪১৭ খৃঃ (১৩৩৬ শক) বঙ্গবাসীর প্রকাশিত সংস্করণে ১৩৩৯ শক (১৪২০ খৃঃ) ও বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকের লেখক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের মতে ১৩০৬ শক (১৩৮৩ খৃঃ) চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদাবলী আগ্রহে ও আনন্দে শ্রবণ করিতেন।

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত : মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কবিরা নিজ পদাবলীর মধ্যে গৌরচন্দ্রিকা (গৌরাঙ্গের গুণাবলী) কীর্ত্তন করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কবিদিগের মধ্যে কৃষ্ণ নামের পূর্ব্বে গৌরাঙ্গগুণ কীর্ত্তন প্রচলিত প্রথা ছিল। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে কোথাও গৌরচন্দ্রিকা নাই।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক। উভয়ে উভয়ের গুণাবলী

শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎকণ্ঠিত হন। ফলে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে উভয়ে মিলিত হন।

"সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝ হি, বটতলে সুরধনী তীরে।
চণ্ডীদাস কবি রঞ্জনে মিলল, পুলকে কলেবর গীর॥"

বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৪০১ খৃঃ (১৩২০ শকে) পঞ্চ-গৌড়েশ্বর শিবসিংহ তাঁহাকে বিসপী গ্রাম দান করেন। *

তবেই পাওয়া যাইতেছে, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার একটী পদে পাওয়া যায়ঃ—

"বিধুর নিকটে নেত্র, পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিজ্জা।
চণ্ডীদাস রসকৌতুক কির্জ্জা॥" +

---

* "পঞ্চ গৌড়াধিপ শিব সিংহ ভূপ,
কৃপা করি লউ নিজ পাস।
বিসপী গ্রাম দান করিল মুঝে,
রহই চরি পাত নাঁইমান॥
—বিদ্যাপতি

+ বিধু—১, নেত্র—২, পক্ষ—২, পঞ্চবাণ—৫, নবহুঁ—৯, রস—৬,
ভিন্ন পাঠ :—

বিধুর নিকটে নেত্র, পক্ষ, পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস হই পরিমাণ॥

অর্থাৎ ১৩২৫ শকে তাঁহার পদাবলীর সংখ্যা ৯৯৬ হইয়াছিল। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ১৩২৫ শকের পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কত বয়সে এই গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই; সুতরাং তাঁহার জন্মকালের কোন বিশেষ বর্ষ উল্লেখ করা যায় না।

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয় আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পদাংশটী পাঠ করিয়া "আতঙ্কে শিহরিয়া" উঠিয়াছেন। তাঁহার মতে "চণ্ডীদাস পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি দ্বিতীয় শুভঙ্করুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, (মহাপুরুষদিগের লীলা কিছুই বুঝা যায়না) তবে এ পদ তাঁহার হইতে পারে।" * মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদি না শিহরিয়া একটু ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক চণ্ডীদাসের পদগুলি আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে এই পদাংশটী কাণের ভিতর দিয়া মরমে 'শেলের ন্যায়' প্রবেশ করিত না। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এরূপ হেঁয়ালী বিরল নয়। তাঁহার সম্পাদিত চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদগুলির যে কোনটী খুলিলেই এরূপ হেঁয়ালী দেখিতে পাইবেন। একটা নমুনা দিলাম ঃ—

"বসুতে গ্রহেতে করিয়া একত্রে
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যুঝিতে
সহজের এই রীতি॥"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাস পৃঃ ৭।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চণ্ডীদাস ভবানীচরণের ঔরসে ও ভৈরবা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাশুলীর কৃপায় পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া কবির পিতা পুত্রের নাম "চণ্ডীদাস" রাখেন। চণ্ডীদাসের আর একটি নাম ছিল অনন্ত। *

১২৮০ সালের ১০ই পৌষের "সোমপ্রকাশে" জনৈক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "চণ্ডীদাসের ১৩০৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গানাথ বাগচী।" লেখক মহাশয় কোথা হইতে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চণ্ডীদাস স্বীয় পদাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ১৩২৫ শকে ৯৯৬টী গীত রচনা করেন। তবে কেমন করিয়া বলিব যে তিনি ১৩০৯ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় ১৩৭৩ শকের লিখিত প্রাচীন পুথি হইতে দেখাইয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানীচরণ ও মাতার নাম ভৈরবী দেবী ছিল।† অধিকন্তু তিনি নান্নুর গ্রামে অনুসন্ধানে উক্ত নামদ্বয় পাইয়া-

* "অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলীগণে॥"

কৃষ্ণকীর্ত্তন—বৃন্দাবন খণ্ড।

কবি লিখিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় কর্তৃক সংগৃহীত। ইহার অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অনুরূপ। এই গ্রন্থে বহুস্থানে অনন্ত বড়ু নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

† আমি ১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে একস্থলে পাওয়া যায়, "ভবানী চরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে ভৈরবী

ছেন। তাই আমরা সোমপ্রকাশের লেখক মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রজসুন্দর বাবুর কথাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে" পারেন নাই। তাহার কারণ তিনি আজন্ম নান্নুরের নিকট বাস করিয়া ও নান্নুরের বহু ভদ্রলোকের নিকট বহু দিন হইতে পরিচিত হইয়াও চণ্ডীদাসের পিতা মাতার সন্ধান করিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত কারণে আমরা কিন্তু ব্রজবাবুর ১৩৭৩ শকের পুঁথির ও প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বের তাঁহার বীরভূম-বন্ধুর কথা উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমরা নান্নুর গ্রামে অনুসন্ধান কালে দেখিয়াছি যে, তত্রস্থ কোন ভদ্রলোকই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখেন না। এরূপ স্থলে কোন্ সাহসে ব্রজবাবুকে মিথ্যা-বাদী বলিব।

চণ্ডীদাসের পিতা ভবানী চরণের অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি স্বগ্রামে গ্রাম্যদেবী বাশুলীর (বিশালাক্ষীর) পূজক ছিলেন। দরিদ্র পিতা মাতার স্নেহে শৈশবকালে চণ্ডীদাস সাংসারিক কষ্ট জানিতে পারেন নাই। কিন্তু হায়! মধুর প্রভাতের পর উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন না হইয়া চণ্ডীদাসের জীবনে অতি ঘোরান্ধকারময়ী রজনী আরম্ভ হইল। চণ্ডীদাস বাল্যে পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া অনাথ হইলেন। পিতা কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই, চণ্ডী একেবারেই নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইলেন।

নাম্নী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়।"

ব্রজবাবুর চণ্ডীদাস চরিত পৃঃ ৯।

তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান কোথাও ছিল না। দুই মুষ্টি উদরান্নের জন্য চণ্ডীদাস ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সহৃদয় গ্রামবাসীরা চণ্ডীদাসের কষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত দিয়া বিশালাক্ষীর পূজক নিযুক্ত করিলেন। চণ্ডীর অন্নকষ্ট দূর হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নান্নুরের তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব কোণে তেহাই গ্রাম হইতে রামমণি নাম্নী এক দুঃখিনী রজক কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। * গ্রামবাসীরা রামীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে বাশুলী দেবীর মন্দির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরের নীলরতন বাবু রামীর বাড়ীর কথা ও মন্দির মার্জ্জনার কথা শুনেন নাই। আমরা কিন্তু শুনিয়াছি—স্বয়ং চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, রামী অল্প বয়সে মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, এবং এখানে আসিয়া তাহার রূপও দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

"অল্প বয়সে দুঃখিনী রামীনী
সেবাতে নিযুক্ত হ'ল।
চণ্ডীদাস কহে শশীকলার ন্যায়
ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন, "ধোপার জল যে অস্পৃশ্য, দেবতা-গৃহ মার্জ্জনার জন্য যে ধোপানী নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা যে এ

* শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় ১৩৭৩ শকের হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথিতে রামমণির পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম লক্ষ্মী পাইয়াছেন। রামীর একটী ভগিনী ও দুইটী ভ্রাতা ছিল। তাহার জননী, ভগিনী ও ভ্রাতাদ্বয়ের কাল হওয়ায় সনাতন সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন। পরে অন্নাভাবে রামী বিশালক্ষীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে রামীর বয়স পঞ্চদশ বর্ষ।

কালের লোককে বুঝাইতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।" বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশে এখনও দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার করিবার জন্য ধোপা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বাগ্দী জাতি নিযুক্ত হইয়া থাকে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বগ্রামে ব্রাহ্মণদের বাটীতে অনুসন্ধান করিলে অনেক বাগ্দী পরিচারিকা দেখিতে পাইবেন।

যাহা হউক, আমাদের রামমণি, দেবীর কাজে বিশেষ নিপুণা হইয়া উঠিল। পবিত্রভাবে রামী সমস্ত কার্য্যই করিত; গ্রামবাসীরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

"রামীনী কামিনী কাজেতে নিপুণা
সকলের প্রিয়তমা॥"

পরে সাধক চণ্ডীদাসের প্রেম-সাধনায় এই রামমণি-ই উত্তর-সাধিকা হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস পূর্ব্বে ঘোর বামাচারী শাক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া রক্ত-চন্দনে সিক্ত করিয়া ভক্তিসংকারে বিশ্বমাতা চণ্ডীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতেন, ও ফুল্ল-কুসুমদলে প্রত্যহ দেবী-বিগ্রহ সুসজ্জিতা করিতেন। বাশুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর পূজায় মদ্য, মাংস ব্যবহার করা হইত। *

পাগলা চণ্ডী যে পবিত্র বাশুলী দেবীর মন্দিরে বসিয়া জগজ্জননীর

* "বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
চৈতন্য ভাগবত।

পূজা করিতেন ও প্রেমে কাঁদিতেন, সে মন্দির আর নাই। তথায় একটি ঢিপি বর্ত্তমান আছে। এই ঢিপির প্রতি পরমাণুতে চণ্ডীদাসের জীবনের সুখ দুঃখের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, বিরহ-কাতরতার কথা, কত বেদনা-বিষাদের সুদীর্ঘ কাহিনী অব্যক্ত-ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমের যে মধুর লীলা হইয়াছিল,—তাহার স্মৃতি এই স্থানের প্রতি পরমাণুর সহিত বিজড়িত হইয়া আছে। উপরোক্ত ঢিপির উত্তরে বর্ত্তমান বাশুলী দেবীর মন্দির। মন্দিরটী ১২৯৯ সালে বাশুলীর বর্ত্তমান পূজক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা প্রস্তুত।* মন্দিরের পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অনেকগুলি শিব-মন্দির আছে। আমাদের বিশ্বাস, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উক্ত শিবমন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কারণ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে অথবা পীঠস্থানে এইরূপ শিব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহাই প্রচলিত প্রথা ছিল।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাস-চরিতে" লিখিয়াছেন, "এখনও এই দেবী-মন্দির বিদ্যমান আছে। * * * দেবী প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজা, মহাদেবের বক্ষোপরি সংস্থাপিতা।" ইনি কোথা হইতে এ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা জানি না; আমরা কিন্তু

---

* নান্নুরে অনুসন্ধান কালে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, বর্ত্তমান বাশুলী মন্দিরটী তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত। তিনি ভিত্তি খনন কালে ভিত্তিমূলে জমাট পত্তনের (Concrete) ৪।৫টী স্তর দেখিতে পান; তাহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে ইতিপূর্ব্বে উক্তস্থানে ৪।৫ বার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল

নান্নুরে মার অন্য মূর্ত্তি দেখিয়াছি—মহাদেবের নাভিকমলে বাম-পদোপরি আসীনা চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি। দেবীর দক্ষিণ-পদ মহাদেবের উরুদেশে স্থাপিত ও ত্রিহস্তে বীণা ও একহস্তে জপমালা।

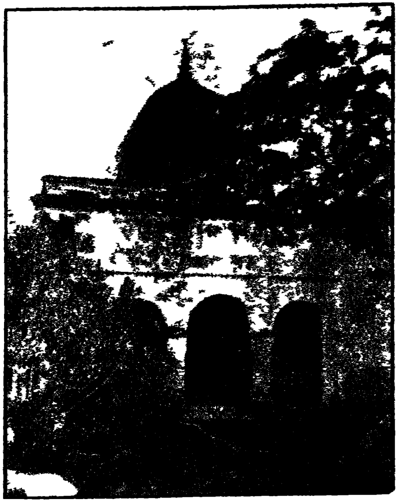
নান্নুরে বাশুলী দেবীর পূজাকালে নিম্নলিখিত ধ্যান ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং শারদ-বদনাং চতুর্ভুজাং
বীণা চণ্ডিকা দেবীং সুপ্রসন্নাং বরপ্রদাং
ত্রিহস্তে বীণাচৈব একহস্তে জপায়িনী
বাম পদ পদ্মাসনে দক্ষিণপদ শিবোপরি
সচন্দন বিল্বপত্রেং পুষ্পং ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষী দেব্যৈ নমঃ।

কিন্তু তন্ত্রসারে নিম্নলিখিত ধ্যান লিখিত আছে ;—

"ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদপ্রভাম্।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ-খেটক ধারিণীম্॥
নানালঙ্কার সুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্॥
মুণ্ডমালাবলী রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্ট দায়িকাম্।
সর্ব্বসৌভাগ্য জননীং মহাসম্পৎ প্রদাং স্মরেৎ॥"

তন্ত্রসারের ধ্যানে মার পূজা হয় না বলিয়া নীলরতন বাবু বলিয়াছেন—"মূর্খ পূজকের দ্বারা ধ্যানটি বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু উপায় নাই।" আমরা কিন্তু মনে করি যে, নান্নুরের পূজক মহাশয় চতুর্ভুজা





বাশুলার মন্দির ও মূর্ত্তি।

(চণ্ডীদাসের জন্য গৃহীত আলোক চিত্র।

মূর্ত্তির পূজায় তন্ত্রসারোক্ত দ্বিভুজা মূর্ত্তির ধ্যানে পূজা না করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। তন্ত্রসারে নানা দেবদেবীর ধ্যান সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই সংগ্রহে যদি চতুর্ভুজা বাশুলী দেবীর ধ্যান স্থান না পাইয়া থাকে, তবে কি দ্বিভুজা ধ্যানে পূজা করিতে হইবে ?

আর এক কথা, একই মূর্ত্তির নানারূপ আমরা নানাস্থানে দেখিতে পাই—দুর্গোৎসবে মা'র দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা,অষ্টভুজা,দশভুজা ও অষ্টাদশ ভুজা মূর্ত্তি আছে। তাই বলিয়া মূর্ত্তির অনুরূপ ধ্যান ত্যাগ করিয়া একই ধ্যানে সকলের পূজা করা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

চণ্ডীদাসের সময়ের অতি পূর্ব্ব হইতেই ভারতের ধর্ম্মজগতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। পুরাতনের সহিত নূতনের সংগ্রাম,—মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত শৈবধর্ম্মের আর তত আদর ছিল না ; মনসা, ষষ্ঠী, বেহুলা ইত্যাদি গ্রাম্যদেবীগণ একে একে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সাধারণে ইঁহাদের মাহাত্ম্য শ্রবণে মুগ্ধ ও তন্ত্রের পঞ্চমকার সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। জগতপাতার বিধানবলে এই পরিবর্ত্তনের যুগে প্রবর্ত্তয়িতারূপে নবভাব ও ভাষা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চণ্ডীদাস নান্নুরে জন্মগ্রহণ করেন। বহুদিন পরে আবার আর্য্য-ঋষিপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বীজ নূতন করিয়া বপন করিবার জন্যই চণ্ডীদাসের জন্ম। এই বীজ-ই শ্রীচৈতন্যদেবের যত্নে মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া পুষ্প ও ফল ধারণ করে—যে পুষ্পের সৌরভে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল—যে ফল আস্বাদনে বঙ্গবাসী প্রেমে ভাসিয়া গিয়াছিল।

চণ্ডীদাস কবি—বঙ্গের আদি কবি। তিনি এই পরিবর্ত্তনের যুগে তাঁহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণের যে ইতিহাস স্বরচিত কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই এই অংশটী সঙ্কলন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—বাঁকুড়া জেলার অধীন গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত শালতোড়া গ্রামে নিত্যাদেবীর আদেশে তাঁহার সহচরী ডাকিনী বাশুলী নান্নুর গ্রামে আসিয়া নিদ্রাবস্থায় তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। কি পুণ্য পবিত্র মধুরতাময় সে স্পর্শ। সেই স্পর্শে যেন মানসপট হইতে একটা ঘন আবরণ অপসারিত হইল—যেন কোন অতীতের বিস্মৃতপ্রায় একটী অঙ্গীকৃত প্রতিশ্রুতি মনে জাগিয়া উঠিল। সেই স্পর্শে চণ্ডীদাস বুঝিলেন, মায়ার ছলনায় তিনি বিশ্বপিতার চরণ-প্রান্তের প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া সংসারের অনিত্য খেলায় মজিয়াছেন। আজ এই শুভমুহূর্ত্তের শুভস্পর্শে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল—তিনি নবজীবন লাভ করিলেন।

"শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্য সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥

চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে নিদ্রা ভাঙ্গিল
পিরীতি হইল সুরু॥"

সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল করিয়া নিত্যধামে যাইবার যে পথ আছে

তাহাকে ভাব কহে। এই ভাবের অপর নাম প্রেম—ইহাই সহজ ভজন। চণ্ডীদাস প্রেম উপাসনায় আদিষ্ট হইলেন।

"নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ তপ. করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে॥"

বাশুলী তাঁহাকে মধুর রসের উপাসনা করিতে উপদেশ দিলেন। দক্ষিণ দেশে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, পরকীয়া ভজন অর্থাৎ ব্রজভাবানুসারে ভজনই শ্রেষ্ঠ। তিনি আরও বলিলেন, রজক কন্যা রামী তাঁহার উত্তর সাধিকা হইবে।

"বস্তুতে গ্রহেতে করিয়া একত্রে
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে সদাই যুঝিতে
সহজের এই রীতি

দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিত
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে
আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি পরকিয়া, যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি,
রামিনী নাম যাহার॥"

দক্ষিণ দেশ দ্বারা বাশুলী দেবী উপনিষদোক্ত দক্ষিণ মার্গ নির্দ্দেশ করিতেছেন। জীবের উৎক্রান্তির দুইটী মার্গ আছে ঃ—উত্তর মার্গ অর্থাৎ দেবযান ও দক্ষিণ মার্গ অর্থাৎ ধূমযান। এতদুভয়ের মধ্যে দেবযানই শ্রেষ্ঠ। ধূমযানে অথবা দক্ষিণ মার্গে গমন করিলে আবার মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয়।

"তস্মিন্ যাবৎসংপাত মুষিত্বাঃথৈত মেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে * *"

ছান্দোগ্য ৫।১০।৫

কিন্তু দেবযানে অথবা উত্তরমার্গে গমন করিলে ব্রহ্মলোকে উপনীত হওয়া যায়। ব্রহ্মলোক হইতে আর মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

"এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে॥"

ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫

বাশুলীর উপদেশে চণ্ডীদাসের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন কথা॥
সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
রতির আকৃতি বলিয়া যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ সাধে॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
একথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥
সামান্য রসকে কি রস যজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটী দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে।"

বাশুলী উত্তর করিলেন ঃ—

"বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥

প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি যে হই॥
সাতাশী আখরে সাধবে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে সামান্যা রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আখরে সামান্যা রস।
তাহাতে কিশোর কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস বেদান্ত সমুদ্র পার॥"

বাশুলীর উপদেশ শ্রবণে চণ্ডীদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন :—

"প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন্ বরণ হব।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥"

বাশুলী বলিলেন :—

"বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে।
একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥"

ভেদের বিনাশ হইবে। ভেদ নাশ প্রাপ্ত হইলে নিত্য অর্থাৎ পরমধামে যাইবে।

"যদ্ গত্বানা নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" গীতা ১৫।৬

যেখানে পৌঁছিলে আর আবর্ত্তন করিতে হয় না, আমার সেই পরম ধাম। বাশুলীর কথা শুনিয়া চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন; বাশুলী দেবীও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইল।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেল॥"

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর চণ্ডীদাস ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ—

"এক নিবেদন, করি পুনঃ পুন
শুন রজকিনী রামী।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥

* * *

ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার॥"

চণ্ডীদাসের বাক্য শ্রবণে রামী আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তিনিও বাশুলীর নিকট হইতে ঐরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামীকে বাশুলী বলিয়াছেন ঃ—

"চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে, নিত্যধাম পাবে
আমার বচন ধর॥
নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভজিবা
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্রে ছাড়িয়া নরকে যাইবা
ভজন নাহিক তবে॥"

বাশুলীর আদেশে রামী ও চণ্ডীদাস উভয়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—উভয়ে মিলিত হইলেন। এই প্রেম সাধনার ফলে বঙ্গবাসী চণ্ডীদাসের বেণু-বীণা-ঝঙ্কার শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

দেশের সৌভাগ্য উদয় হইলে গুণবান পুরুষের জন্ম হয়। কিন্তু যে দেশের লোক গুণবান পুরুষের জীবন কালে তাঁহাদের গুণের সমাদর করিয়া উৎসাহ প্রকাশ অথবা সাহায্য করে, সে দেশ অধিক সৌভাগ্যশালী; বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি রাজা শিব সিংহের, মুকুন্দরাম রাজা

রঘুনাথ দেবের, ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের, জয়দেব রাজা লক্ষ্মণ সেনের * সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের জন্মে বঙ্গদেশ সে কলঙ্ক হইতে রক্ষা পায় নাই। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। তিনি সমাজ-শাসনে কাতর হইয়াছিলেন; ঢক্কানাদে তাঁহার কলঙ্ক গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল।

"দুঃখের কথা কইতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটে বলতে নারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥"

সাধারণে চণ্ডীদাসের প্রেম বুঝিল না। তাহারা চণ্ডীর অপবাদ গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিতে লাগিল।

"পিরীতি করিল, জগতে ভাসিল
ধোপানী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল, কলঙ্ক ভাসিল
কাণাকাণি লোক জনে॥"

প্রভুত্বের কি মোহিনী শক্তি—যেখানে প্রভুত্ব, সেইখানেই অত্যাচার—পর পীড়ন। তাই সমাজের ক্ষমতাবানেরা চণ্ডীদাসকে সমাজ-চ্যুত করিলেন, ফলে চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর সেবা কার্য্য হইতে বিদূরীত হইলেন।

---

* লক্ষ্মণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারে লিখিত ছিল :—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষণ স্যচ॥"

প্রেমের বলই প্রধান বল। প্রেম-বলের সহিত তুলনায় প্রাধান্য, প্রভুত্ব, ক্ষমতা অতি তুচ্ছ—অতি হেয়। যিনি সেই প্রেম লাভে সমর্থ হইয়াছেন, প্রেমের রাজ্যে—প্রেমময়ের কাছে পৌঁছিতে কোন বাধা কোন বিঘ্নই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে না। প্রেমিক চণ্ডীদাস সমাজ শাসন উপেক্ষা করিয়া গ্রামের প্রান্তে রজকিনী-আলয়ে বাশুলী-দেবী-প্রদত্ত মন্ত্রের সাধন করিতে লাগিলেন।

চণ্ডীদাসের রজকিনী আলয়ে বাসের কথা সহস্রমুখে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। প্রেম সাধনা করিয়া প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস সাধারণের নিকট হইতে তীব্র, কটু, শ্লেষপূর্ণ উক্তি পুরস্কার স্বরূপ পাইতে লাগিলেন। লোক-গঞ্জনায় রামী অস্থির হইয়া একদিন চণ্ডীদাসকে নান্নুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য বলিল :—

"কি কহিব বঁধুহে বলিতে না জুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে পোড়ামুখে হাসি পায়॥
অনামুখ মিন্‌সে গুলার কিবা বুকের পাটা।
দেবী পূজা বন্ধ করে কুলে দেয় কাঁটা॥
দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটেনা বল্‌তে নারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাকপিটিয়ে সহজ বাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে।
ঝঞ্জনা পড়ুক তার মস্তক উপরে॥
অবিচার পুরী দেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব॥

বাশুলী-দেবীর যদি কৃপাদৃষ্টি হয়।
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটী পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা॥”

এ পৃথিবীতে কোথাও পূর্ণতা নাই, তাই ধনী আরো ধন চায়, মানী আরো মান চায়, যশস্বী আরো যশঃ চায়। কিন্তু যত দিবে, শূন্যতা আরো তত বাড়িবে বই কমিবে না। যেদিন সংসারের অনিত্য বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধন ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া প্রেমময়ের সহিত মিলিতে পারিবে—সেই দিন আত্মার এ শূন্যতা—এ ক্ষুধা দূর হইয়া চরম শান্তি,'চরম তৃপ্তি লাভ করিবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অন্তরের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া, পার্থিব অসার সুখ ধূলির মত ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত আকুলভাবে সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিতেছ, ততদিন ধন, যশঃ, মান ও উচ্চপদের জন্য, স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য, আজীবন পরিশ্রম করিয়াও তৃপ্তি পাইবে না,—ততদিন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্যের তাড়নায় অন্যের কৃত ইষ্টে বা অনিষ্টে, প্রশংসায় বা নিন্দায়, উপকারে বা অপকারে, ভালবাসায় বা হিংসায় তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবেই হইবে। প্রেমসাধনার বলে চণ্ডীদাস প্রকৃত অন্তরদৃষ্টি পাইয়াছিলেন; তাঁহার প্রেমে বাসনার অতৃপ্তি ও রূপ পিপাসা ছিল না। তিনি কঠোর আত্মসংযমে ও ভোগ-বাসনার দমনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে পরিতৃপ্ত—সাধারণের মতামত তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই ভগ্নহৃদয়া রামীর বিলাপ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান মানসে মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—

১। "ইন্দ্র আদি করি, সুর-নর দানব,
তিনপুর জিনিল দশমাথে।
বিশ বাহুপর বিজয় ধনুর্দ্ধর
নৃপতি নিশাচর নাথে॥
মণিময় কুণ্ডল রত্ন সব আভরণ
শোভা করল দশ মুণ্ডে।
দ্বিগ্বিজয় করি, বিক্রম কেশরী
ছত্র ধরল নব খণ্ডে॥
সোহ লঙ্কাপতি, দৈবে হরল মতি
বিপদ সময় তব ভেলা।
রতন মুকুট পর, বনচর বানর
চরণ ঘাত কত দেলা॥
হরি হরি দৈব কি গতি নাহি জান।
কভু সুখ সম্পদ, কবহু রাজপদ
করহুঁ গুরু অপমান॥
ভণয়ে চণ্ডীদাস ইহা বড় বাত।
হানি, লাভ, জীবন, মরণ, সুখ, যশ,
অপযশ বিধি হাত॥"

২। "পঞ্চম পুরুষ মুখ না হেরই যোই।
ভূত পিশাচিনী হোয়ত সোই॥
যো নাহি জানত ইহ-পর-সুখ।
প্রাতই তাকর না হেরই মুখ॥

চণ্ডীদাস কহে সে বরনারী।
ইহ রস নাই জানে পাঁচ ভাতারি॥"

৩। "রূপিলে বিষের গাছ, হৃদয় মাঝারে।
গরলে জারল অঙ্গ, দোষ দিব কারে॥
যদি ঘরে রৈতে নার কর অভিসার।
চণ্ডীদাসেতে বলে এই সে বিচার॥"

চণ্ডীদাস রজকিনী আলয়ে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে আত্মীয় বন্ধুগণের স্নেহ ভালবাসা হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। প্রেমোন্মাদ চণ্ডীর ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল ও অন্যান্য পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজচ্যুত করিলেন। সমাজ-পীড়নে ব্যথিত হইয়া চণ্ডীদাসের খুল্লতাত-পত্নী চণ্ডীদাসকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন ও শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনর্ব্বার স্ব সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চণ্ডীদাস ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন:—

"শুনি চণ্ডীদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস
ভিজিয়া নয়ন জলে।
ধোবানী সহিতে, আমি যেন তাথে
উদ্ধার হইব কুলে॥"

যাহা হউক নকুল ঠাকুর প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মণ ভোজনের সমস্ত আয়োজন করিলেন। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া স্নানার্থে সরোবরে যাইয়া দেখেন, রামী জলে বসিয়া এক মনে যুগল মন্ত্রের উপাসনায় নিযুক্ত। রামী নকুলকে দেখিয়া বলিলেন:—

"শুনি নাকি ভাস, পিরীতি নৈরাশ
কুটুম্ব ভোজনে মন।

ঠাকুর নকুল, হয়েছ সফল
তুমি এক মহাজন ॥
তোমার চরিত্র জগৎ পবিত্র
তোমার সাধু সে বাদ।
তুমি সে সকল, জাত্যে পাত্যে ভোল
নীচ প্রেমে উন্মাদ ॥
বর্ণাশ্রম ছাড়, পিরীতিতে দড়
যাহার পিরীতি হয়।
এ সব ভাবিয়া, যে জন করিল,
সে কেন ভারতে রয় ॥"

নকুল স্নানান্তে ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণেরা আহারে বসিয়াছেন,—মহানন্দে সকলে শাক, ঝাল, ঘণ্টাদি দিয়া অন্ন ভোজনে ব্যাপৃত। এ হেন কালে নকুল দেখিলেন ধোপানী রামী নিকটস্থ এক বকুল বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। নকুল ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

"নকুল পাএতে, ধরি দুটী হাতে
ধোপানী কাঁদিয়া বলে।
তুমি মহাজন শুনহ ব্রাহ্মণ
পিরীতির কিবা মূলে ॥
আমি অতি হীন, পিরীতি অধীন
পিরীতি আমার গুরু।
এ তিন আখর, হৃদয়ে যাহার
সে জনা কল্পতরু ॥

পিরীতি ভজিল, পিরীতি সাধিল
পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে, ধোপানী সহিতে
মিশ্রিত একই প্রাণে॥

স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত নকুল রামীকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন সুচারুভাবে সম্পন্ন হইল—চণ্ডীদাস সমাজে উঠিলেন।

চণ্ডীদাসের অবস্থার ছায়াপাত আমরা তাঁহার কবিতায় দেখিতে পাই। প্রেম করিয়া অশান্তি ও উদ্বেগ তাঁহার সহচর হইয়াছিল। তিনি সমাজচ্যুত হইলেন। দুষ্টলোকে তাঁহার কলঙ্ক গ্রামে গ্রামে প্রচার করিল। তাঁহার শ্রীরাধার প্রেমও উদ্বেগবিহীন নয়। শ্রীরাধা চিরদিন জটিলা ও কুটিলার ভয়ে ভীতা ও গঞ্জনায় কাতরা—তাঁহার প্রেম "হারাই-হারাই সদাই হারাই" আশঙ্কায় সঙ্কুচিত ও নম্রমুখ।

পরিণামে সত্যের জয় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসীরা চণ্ডীদাসের পবিত্র প্রেমের পরিচয় পাইতে লাগিল। একদিন বিনোদ রায় * নামক জনৈক ব্যক্তিকে বাশুলী আদেশ দিলেন "আমার সেবক চণ্ডীদাস তোমাদের অত্যাচারে বড়ই উৎপীড়িত হইয়াছে; এইবার আমি তোমাদের শাস্তির বিধান করিব।" এই আদেশে ভীত হইয়া দুষ্ট লোকেরা ক্ষান্ত হইল।

চণ্ডীদাস গাহিলেন :—

---

* শ্রীযুক্ত রমণী মোহন মল্লিক মহাশয় সম্পাদিত সংস্করণে বিনোদ রায়ের পরিবর্ত্তে বিজয় নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নাম দৃষ্ট হয়।

"বিনোদ রায় বন্ধু বিনোদ রায়।
ভাল হ'ল ঘুচাইলে পিরীতের দায়॥"

চণ্ডীদাসের যশঃ-সৌরভ চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া মিথিলায় পৌঁছিল। পঞ্চ গৌরেশ্বর শিবসিংহের প্রিয় সভাসদ্ পণ্ডিত ও কবি বিদ্যাপতি চণ্ডী-দাসের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিছুদিন পরে মহারাজা শিবসিংহ কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে আসিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি এ সুযোগ ছাড়িলেন না—তিনি মহারাজের সঙ্গ লইলেন এবং যথা সময়ে মঙ্গলকোট হইতে রূপনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীদাসের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। এক মন্ত্রের উপাসক এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রেমিক চণ্ডীদাস কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনিও বিদ্যাপতির অভ্যর্থনা করিবার জন্য মঙ্গলকোটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি
চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি
দরশন লাগি।

পন্থহি দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গায়ত
দুঁহু হিয়ে দুহু রহু জাগি ॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম শ্রবণে তহি জানল
রূপনারায়ণ গোই ॥"

কেহ কাহারও পরিচিত নহেন,—এমন কি কেহ কাহাকেও দেখেন নাই,—কেবল নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস মঙ্গল-কোট অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, বিদ্যাপতি নান্নুরের উদ্দেশ্যে চলিতেছেন। মধ্যাহ্নে উভয়ে পথিমধ্যে সুরধনী-তটে বটবৃক্ষ-তলে মিলিত হইলেন। * বঙ্গের আদিকবিদ্বয়ের মিলন,—গভীর ও ব্যাকুল-প্রেম চণ্ডীদাসের সহিত নবীন ও মধুর-প্রেম বিদ্যাপতির, কাব্য-ক্ষেত্রে প্রেমাবতার চণ্ডীদাসের সহিত—ভক্ত ও প্রেমিক বিদ্যাপতির মিলন। এ মিলন বর্ণনার বিষয় নহে, পাঠক যদি পারেন হৃদয়ে অনুভব করুন। চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝ হি বটতলে সুরধনী তীরে।
চণ্ডীদাস কবি, রঞ্জনে মিলল, পুলকে কলেবর গীর ॥
দুহুঁ জন ধৈরজ-ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুহুক অবশ প্রতিকার ॥

---

* আমরা বহু অনুসন্ধানেও উক্ত স্থানটী নির্ণয় করিতে পারি নাই। বর্ত্তমানকালে মঙ্গলকোট হইতে নান্নুর যাইতে হইলে পথিমধ্যে অজয় নদ পাওয়া যায়। বোধ হয় ভাগীরথীর পূর্ব্বগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ধৈরজ-ধরি দুহুঁ নিভৃতে আলাপই, পুছত মধুর রস কি।
রসিক হইতে কিয়ে, রস উপজায়ত, রস হইতে রসিক কোহি॥
রসিক হইতে, কিয়ে হোয়ত, রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি, কিয়ে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জনে, শুন তঁহি রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ, লছিমা পদ করি ধ্যান॥"

বিদ্যাপতি উত্তর করিলেন ঃ—

"রসের কারণ, রাসকা রসিক কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত, যাহাতে প্রেম বিলাস॥
স্থুলত পুরুষে কাম সূক্ষ্মগতিঃ স্থুলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে, যে রস হোয়ত, এবে তাহা নাহি গতি॥
দুঁহুক যোটন বিনহি কখন, না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষ যে কিছু হোয়ত, প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ, অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখকালে, অধিক সুখহি তানা কি পুরুষে পায়ে॥
দুঁহুক নয়নে, নিকসয়ে বাণ, বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কামস, তবে কৈহে নিকসয়॥
কাম দাবানল, রতি যে শীতল সলিল প্রণয় পাত্র।
কুল-কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়, পচনে পিরীতি নত্র॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া, যব ভোল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাতে উপরে তাহাকে রস যে কয়॥
ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন, করল তখন ভাষল প্রেম তরঙ্গে॥"

পরে উভয়ে স্নানাদি সমাপন করিয়া নান্নুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা নান্নুরে উপনীত হইলেন। বিদ্যাপতি তথায় বিশালাক্ষীর পূজান্তে রামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে নান্নুরে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া বিদ্যাপতি বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজা শিব সিংহের সহিত মিলিত হইলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ কর্তৃক সম্পাদিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী"র ভূমিকায় "যেমন তেমন করিয়া * * খাড়া" করা জীবনীতে উক্ত ঘটনাটী অবিশ্বাস করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত পদ কয়টী পদ-কল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদ-কল্পতরুর কবিতার প্রতি সন্দেহ না করিয়া বলিতেছেন "পদকল্পতরুর কবিতাগুলি হইতে বুঝা যায় যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মানিলাম—হইয়াছিল। কিন্তু মিলনটা হইল কোথায়? না, গঙ্গাতীরে। আচ্ছা, চণ্ডীদাস নান্নুরে ছিলেন, নান্নুর গঙ্গাতীর হইতে আট ক্রোশ পশ্চিমে। বিদ্যাপতি মিথিলা হইতে চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন। তাহা হইলে তিনি নান্নুরের পশ্চিম দিক হইতে আসিবেন। গঙ্গাতীরে যদি উভয়ের মিলন হয়, তবে চণ্ডীদাস নান্নুর হইতে নিশ্চয়ই পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছিলেন। * * * চণ্ডীদাস পাগল ছিলেন বলিয়া যে তাঁহার "উত্তর-পূর্ব্ব" জ্ঞান ছিল না, ইহা ত মনে হয় না।" আমাদের মতে চণ্ডীদাসের উত্তর-পূর্ব্ব জ্ঞান ছিল; তবে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহাতে সে জ্ঞানের অভাব দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গের মানচিত্র খুলিলেই নান্নুরের (বীরভূমের) পশ্চিমে পুরুলিয়া, হাজারিবাগ, রাঁচী, পালামো, ছোটনাগপুর প্রভৃতি

দৃষ্ট হইবে। অতীতের মিথিলা বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা ও চম্পারণ নান্নুরের (বীরভূমের) উত্তর ও পশ্চিমোত্তর কোণের মধ্যে, গঙ্গার অপর তটে অবস্থিত। কাজেই মিথিলা হইতে বঙ্গে আসিতে হইলে গঙ্গা পার হইতেই হইবে।

আর এক কথা, ৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে গঙ্গার যে গতি ছিল এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চৈতন্যদেবের সময়ে গঙ্গার পূর্ব্বতটে নবদ্বীপ ও পশ্চিম তটে কাটোয়া ছিল। চৈতন্য দেব কেশব ভারতীর আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া আসিবার সময় গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার পশ্চিম তটে উভয় নগরই অবস্থিত। আমাদের বিশ্বাস মঙ্গলকোট ও নান্নুরের মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেন; এখন পূর্ব্ব গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির নান্নুর ত্যাগের পর চণ্ডীদাসের আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় বলেন,—"চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়া সেইখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে জানিতে পারা যায়।" শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজবাসীরা কেশীঘাটে চণ্ডীদাসের সমাধি দেখাইয়া থাকেন। সমাধি মন্দিরটী ভগ্ন; ভগ্ন মন্দিরটী তৃণাচ্ছাদিত হইয়া সামান্য কুটীরে পরিণত হইয়াছে ও বঙ্গবাসী যে গুণীর আদর জানেন না, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলী অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার বৃন্দাবন গমনের কথা আমরা পাই নাই। রমণী বাবুও কোথা হইতে এ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও বলেন নাই। তিনি আরও বলেন,—



চণ্ডীদাসের সমাধি-মন্দির।

(চণ্ডীদাসের জন্য গৃহীত আলোক-চিত্র।)

"চণ্ডীদাস নান্নুরের নিকটবর্ত্তী মতীপুরে * কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় নাটমন্দির পতিত হওয়ায় তাঁহার ও রামমণির মৃত্যু হয়। উল্লিখিত ঘটনাগুলি কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নহে।" আমরা কিন্তু অবিশ্বাসের কোন কারণ পাই নাই। এখনও ভগ্ন নাটমন্দির সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বহু ভক্ত ও বিশ্বাসী হিন্দু আজও তথায় যাইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। অলীক স্মৃতি-চিহ্ন কি পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে?

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সমাধি হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া পুনরায় নূতন স্থানে নূতন সমাধি প্রতিষ্ঠা করিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে সমাধিস্থ হন। বৃন্দাবনের সমাধি হইতে পবিত্র অস্থি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ঝামটপুরে নূতন সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অদ্যাপি গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবের দিন—আশ্বিনী শুক্লাদ্বাদশী দিবসে মহোৎসব ও কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের ব্রহ্মভূমের সমাধিটীও বোধ হয় কির্ণাহারের সমাধি হইতে অস্থি সংগৃহীত হইয়া কোন ভক্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

ভক্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে তাঁহার বৃন্দাবন গমন অথবা তদ্রূপ কোন বাসনার বর্ণনা পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালেও কোন বৈষ্ণব কবি এ বিষয়ে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। আজন্ম বাঞ্ছিত বাসনার সফলতা

* মতীপুর নহে। নান্নুরের নিকটবর্ত্তী কির্ণাহার গ্রামের নাগডিহি নামক পল্লীতে চণ্ডীদাসের সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

দৃষ্টে, কবি হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইয়া যে কোন পদ সৃষ্ট হয় নাই তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? তাই আমরা মনে করি বঙ্গীয় সুনীল সাহিত্য গগনের সুন্দর সমুজ্জ্বল সান্ধ্যতারকাটী বিধি নির্ব্বন্ধে অসময়ে এই কির্ণাহারের নাটমন্দিরে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে বৃন্দাবন কোথায় ছিল, তাহা কেহ জানিতেন না। দয়ার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের ঐকান্তিক চেষ্টাতে শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্তপ্রায় লীলাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা তাঁহার জীবনের একটী উদ্দেশ্য ছিল।

"কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম, সেবা প্রবর্ত্তন,
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ।
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন,
তাহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্তলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এই কার্য্যে চৈতন্যদেবের আদেশে সনাতন

"মথুরা মাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া,
লুপ্ততীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৫শ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যদেব নিজেও অনেক তীর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তিনি

"রাধাকুণ্ড বার্ত্তা প্রভু পুছে লোক স্থানে,
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।
তীর্থলুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৮শ পরিচ্ছেদ।

মাধবেন্দ্র পুরীও অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র বা বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ;

"গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে চল তারে বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যখন বৃন্দাবনের তীর্থ সব লুপ্ত ছিল—তখন কেমন করিয়া বলিব যে চণ্ডীদাস বৃন্দাবনে সমাধিস্থ হইয়াছেন। রমণী বাবু বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের সমাধির কথা শুনিয়া সর্ব্বজনবিদিত মূল সমাধিটীকে বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়াছেন।

এইবার আমরা রামীর * সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব।

---

* এই রজক কন্যাকে চণ্ডীদাস নিজ পদাবলীতে "রামী" অথবা "রামীণি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাই আমরা উক্ত নামদ্বয় ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পাঠে জানা যায় যে উক্ত রজক কন্যার নাম রামতারা দাসী ছিল। কবি নরহরি বলিয়াছেন :—

"নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে
বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ নওল চরিত
কহয়ে নিকটে গিয়া॥
শুনি ভাবে মনে জানি পুন
দেবী কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবনী দরশে
যুরিবে বিবিধ মতে॥"

বর্ত্তমান কালের ভিখারী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী দেখিয়া অনেকের ধারণা যে বৈষ্ণব হইতে হইলে একটী বৈষ্ণবীর প্রয়োজন এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে রামীর প্রেম উপলক্ষে চণ্ডীদাসের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেননা যে বৈষ্ণবের পক্ষে পরনারী কায়মনোবাক্যে পরিত্যজ্যা; এমন কি, অনেক বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া পরিণীতা পত্নী সঙ্গে বাস করিতে হয়। চৈতন্যদেবও কামিনীস্পর্শকে মৃত্যুর কারণ বলিতেন।

"গোবিন্দ, তুমি মোর আজ করিলে রক্ষণ।
নারী স্পর্শ হইলে মোর হইত মরণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এমন কি সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ছোট হরিদাস মাধবী দাসীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব মহিলাদের পাতিব্রত্যের কথা উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা পরপুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেন না। বৈষ্ণব মহান্ত-

---

কবি কানুদাস বলিয়াছেন :—

"রামতারা ধনী রাধা-স্বরূপিণী
ইষ্ট ধাতু যার হয়।
যাঁহার দরশে চণ্ডী রসে ভাসে
কবিতার স্রোত বয়॥"

রাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন :—

"মরি মরি কি রীতি পীরিতি-রস শশধর
তারা সহ রস কো করু ওর।"

গণের মাতৃস্থানীয়া নিত্যানন্দ-ঘরণী শ্রীমতী জাহ্নবী ঈশ্বরী একবার খেতুর গিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি অতি নির্জ্জনে থাকিতেন।

"মনের উল্লাসে সবে বৈসে দিব্যাসনে।
জাহ্নবী ঈশ্বরী বৈসযে সঙ্গোপনে॥"

ভক্তি রত্নাকর—১০ম তরঙ্গ।

একবার শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌরপ্রেমেউন্মত্ত বালক শ্রীনিবাসকে দেখিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু শ্রীনিবাস তাঁহাকেও দর্শন দিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিলেন।

"শ্রীনিবাস প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী।
দাড়াইলা সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ স্মঙরি॥"

ভক্তিরত্নাকর—৪র্থ তরঙ্গ

পরবর্ত্তীকালে সহজীয়াগণ গোপী-প্রেমের অনুকরণে সনাতন পতি-পত্নী সম্বন্ধকে পদদলিত করিয়া পরনারী গমনকে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির হেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অতীব পাপজনক। *

যাহা হউক আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি ; আমাদের রামীর প্রেম মধুর রসের অন্তর্গত। আমরা সামান্যার্থে তাহা গ্রহণ করিয়া চণ্ডীদাসের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকি। উন্নত হইয়া অধিকারী না হইলে ভগবৎভক্তদের বিষয় বুঝিবার সাধ্য নাই। আমরা নশ্বর কামের সহিত অবিনশ্বর প্রেমের পার্থক্য বুঝি

---

* সহজীয়াদের সাধনে নায়িকার একান্ত প্রয়োজন। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডীদাসের অনেক পদ সহজীয়া প্রভাবে বিষ-বিন্দু-সংস্পৃষ্ট ; এমন কি রামীও তাহাদের যোজনা।

না, তাই আমরা রামীর প্রেমে আত্মচিন্তা, আত্মজ্ঞান ও আত্মতৃপ্তি পূর্ণ কামগন্ধ পাই। চণ্ডীদাস স্বয়ং বলিয়াছেন রামীর প্রেমে "কামগন্ধ নাহি তায়"; কারণ ইহাই পূজা, অর্চ্চনা, যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা ও ধর্ম্ম। রামীর প্রেম যে স্বর্গীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যুবতী স্ত্রীসহ একত্রে বাস করিয়া কে বলিতে পারে,—

"তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়নে তারা॥"

যে হৃদয় প্রিয়তমাকে পিতৃ-মাতৃরূপে—দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া, আরও উচ্চতর বিশেষণে বিশেষিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত, সেই প্রেম-পিপাসু হৃদয়ে কলঙ্ক আরোপ করা যায় কি? পাঠক! প্রেমের এমন অপরূপ ভাব আর কোথাও দেখিয়াছেন কি?

চণ্ডীদাস সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। রাসলীলা, গোবৎস হরণ প্রভৃতি পাঠ করিলে জানা যায় যে তাঁহার ভাগবতে সম্যক্ অধিকার ছিল। তিনি বহু সংস্কৃত পদের কোমলতা সম্পাদনপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছেন; সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকিলে ইহা কি সম্ভব হয়? আমরা নিম্নে কয়েকটী শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলাম ঃ—

জন্ম—জনম, ধর্ম্ম—ধরম,

প্রাণ—পরাণ,	প্রীতি—পীরিতি,
যত্ন—যতন	প্রমাদ—পরমাদ,
প্রবাস—পরবাস	উচ্চ—উচ,
চিত্ত—চিত	নিষ্ঠুর—নিঠুর,
স্পর্শ—পরশ	অমৃত—অমিয়,
নির্দ্দয়—নিদয়	খ্যাতি—খেয়াতি
প্রয়াণ—পয়াণ,	বদন—বয়ান, ইত্যাদি

চণ্ডীদাসের, গীতগোবিন্দ পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে" আমরা জয়দেবের অনেক গীতের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। নিম্নে আমরা ২টী পদ উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

"তোর রতি আশোআশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করি মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোমার সঙ্কেত বেণু বাজায়ে যতনে ॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোমাকে চিন্তিতে আছে নন্দের নন্দনে ॥
তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকে করয়ে কানু অতি বহু মানে ॥
পাখি বসিতে তরুপাত চলনে।
তোমার গতি শঙ্কিয়া রচয়ে শয়নে ॥
চাহে দশদিশ কানু চকিত নয়নে।
কতখণে আইসে রাধা এহি করি মনে ॥

তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে॥
গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিয়া পল্লব শয়নে॥
মানী বড় ভৈল কানাই শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল শুনী॥
এবে অনুগত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণে॥'

(২)

যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন-রুচি তোমারে।
হরে দুরুবার ভেয় অন্ধকার
সুন্দরি রাধা আমারে॥
তোমার বদন সং পুন চাঁদ
অধর অমিয়া লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন-চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥
মদন-বাণে দগধ ভৈলো
তোর অকারণ মানে।
বদন-কমল মধুপান দিয়া
রাখহ মোর পরাণে॥

যতে সতো কোপ করিলে
তবে মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজ যুগে বন্ধন করিয়া
অধর দংশ দশনে॥
তোমে সে মোহর রতন ভূষণ
তোমে সে মোহর জীবনে।
এহ বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুঝি তে অতি যতনে॥
তোমার নয়ন মলিন নলিন
আধার কোকনদ রূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেহ
এ তোর আত্মরূপে॥
এ তোর কুচ শোভে মণি জঘনে
নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করো মো তোহর
থল কমল চরণে॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥
পাওাউ আমার মদন বিকার
সত্বরে করহ আদেশে।
বাশুলী চরণ শিরে বন্দিয়া
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

উদ্ধৃত পদ দুইটী জয়দেবের প্রসিদ্ধ 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশং' ও 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী হরতি দরতিমিরমতি ঘোরং' পদদ্বয়ের সুন্দর অনুবাদ বলা যাইতে পারে।

(পরিশিষ্ট।)

[প্রবাদ অবলম্বনে]

সর্ব্বপ্রথমে আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলী ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথী ইত্যাদির সাহায্যে যতদূর সম্ভব তাঁহার জীবনী বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা নান্নুরের প্রচলিত প্রবাদ সমূহ অবলম্বনে চণ্ডীদাসের জীবনী পাঠকগণকে উপহার দিব।

চণ্ডীদাসের জন্ম অথবা তাঁহার পিতামাতার সম্বন্ধে কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই। তাঁহাকে আমরা প্রথমেই বাশুলীর পূজকরূপে দেখিতে পাই। এক দিন তিনি নান্নুরের হাটে মৎস্য ক্রয় করিতে গিয়া দেখেন যে সমমূল্যে তিনি অন্যাপেক্ষা কম মৎস্য পাইলেন। কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর পাইলেন, "প্রেমে সকলই সম্ভব।" সেই হইতে চণ্ডী প্রেমের জন্য লালায়িত হইলেন।

চণ্ডীদাস নদীতে প্রায়ই মৎস্য ধরিতে যাইতেন। এক দিন এক যুবতী রজক কন্যা বস্ত্র ধৌত কালীন তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল রজক কন্যাকে দেখিয়া প্রেম পিপাসু চণ্ডীদাস তাঁহার সহিত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই হইতে চণ্ডীদাস প্রত্যহ মৎস্য ধরিবার ছলে রজক কন্যাকে দেখিবার জন্য

যাইতেন। ক্রমে ক্রমে রজক কন্যাও তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইল— উভয়ে মিলিত হইলেন। এই রজকিনীই আমাদের রামমণি।

একদিন চণ্ডীদাস নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দেখেন, একটী কমল ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি সেই কমলটী সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ইষ্ট-দেবীকে অর্পণ করিবার মানসে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। যথা সময়ে পূজাকালে বাশুলী দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া চণ্ডীদাসকে বলিলেন,— "ও ফুলে আমার ইষ্টদেবের পূজা হইয়াছে; উহা আমার মস্তকে দাও, পদে দিও না।" বিস্মিত চণ্ডীদাস বলিলেন "সে কি মা? তুমি জগত জননী, তোমার আবার ইষ্টদেব কে?" তদুত্তরে বাশুলী দেবী বলিলেন, "আমার ইষ্টদেব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ"। তৎপর চণ্ডীদাস ও রামীকে যুগল মন্ত্রদান করিয়া ও বিষ্ণোপাসনার উপদেশ দিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। সেই শুভ মূহুর্ত্ত হইতে চণ্ডীদাস ও রামী বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

চণ্ডীদাস রামীর সহিত ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে, রজক কন্যার সহিত প্রসক্তি আছে বলিয়া, সমাজচ্যুত করিলেন। সমাজচ্যুত চণ্ডীদাস ও রামী গ্রামের প্রান্তে পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল ঠাকুর তাঁহাকে পুনরায় স্বসমাজে আনয়নের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে ব্রাহ্মণগণ আহূত হইয়া আহারে বসিলেন। চণ্ডীদাস অন্ন ব্যঞ্জনাদি মহানন্দে পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে রামী তথায় আসিয়া বলিল "কি রে চণ্ডে, তুই নাকি আমায় ছেড়ে জাতে উঠছিস্?" চণ্ডীদাসের দুই হস্ত পরিবেশনে আবদ্ধ; তিনি অপর দুই হস্ত বাহির করিয়া রামাকে আলিঙ্গন করিলেন।

রামীও আলিঙ্গন কালে অপর দুই হস্ত বাহির করিয়া স্বীয় মস্তকের স্খলিত বসন পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করিলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী চণ্ডীদাস ও রামীর ঈদৃশ অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে রামীকে পরিবেসনের ভার দিলেন ও চণ্ডীদাসের সমাজচ্যুতির কথা আর তুলিলেন না।

যদিও চণ্ডীদাস সমাজে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার কলঙ্ক আর গেল না। তাই, কলঙ্ক মোচনের জন্য ও স্বগ্রামবাসিগণের আন্তরিক ভাব জানিবার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি নিজ পর্ণকুটীরে পীড়ার ভান করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। দুই তিন দিন পরে প্রতিবাসীরা তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে মৃত জ্ঞানে তাঁহার সৎকারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তাঁহারা শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতার উপরে স্থাপন করিলেন। এমন সময়ে রামী কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং চণ্ডীদাসও চিতোপরি উঠিয়া বসিলেন। শ্মশান বন্ধুরা চণ্ডীদাসকে ভূতে পাইয়াছে বলিয়া সকলে চলিয়া আসিলেন।

চণ্ডীদাসের প্রতিভা।

——*○-*——

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।)

চণ্ডীদাসের পদাবলী পুরাণের সেই পুরাতন কথা অবলম্বনে বিরচিত। কৃষ্ণলীলা ইহার বর্ণনীয় বিষয়। পাগলা চণ্ডীর গান বুঝিতে হইলে সেই পুরাতন কথাগুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক। কৃষ্ণ বৃত্তান্ত আমরা (১) মহাভারত, হরিবংশ ও (২) পুরাণে পাই। ইহাদের মধ্যে মহাভারত সর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে মহাভারতে কৃষ্ণ চরিত্রের এক অংশ আবার পুরাণে অপর অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতের কালে দেশে আর বাহ্যশত্রুর ভয় ছিল না, অনার্য্যেরা তখন দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কাজেই আর্য্যেরা তখন সাগরাম্বুবিধৌতা, গিরি কিরীটিনী, অনন্ত রত্ন প্রসবিনী জন্মভূমির বিভাগে ব্যস্ত ছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। সে সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর বিদ্বেষী রাজ্যে ভারত পরিপূর্ণ ছিল। শস্যপূর্ণ শ্যামল-ক্ষেত্র-পরিশোভিত ভারতকে একচ্ছত্রাধীন করিতে না পারিলে লোক রক্ষাকারী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই কবি শান্তি প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকে সমরবিজয়ী বীর ও রাজনীতি বিশারদ মন্ত্রী করিলেন—তাই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জন্ম।

পুরাণের কালে ভারতের ধর্ম্ম জগতে ঘোরতর বিপ্লব (অনেকের

মতে) দেখিতে পাই। অর্দ্ধাধিক ভারতবাসী সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মত গ্রহণ করিয়াছিল। এই বন্যা হইতে সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের জন্ম হয়। পরবর্ত্তী কালেও আমরা এইরূপ চেষ্টা ২।১ বার দেখিতে পাই। মুসলমান প্লাবিত ভারতে সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য শিখের অভ্যুদয় হইয়াছিল। আবার সেদিন খৃষ্টানদের হাত হইতে বঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্ম হইয়াছিল। ভাগবতকার বীর শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষ সাজাইলেন এবং রাধাকে প্রকৃতি করিলেন। ব্রজলীলায় প্রকৃতি পুরুষের আসক্তি এবং পরে তাঁহাদের বিচ্ছেদ দেখাইলেন। এই জগৎ দ্বৈতবাদিক-প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি পুরুষে প্রথমে সংযোগ পরে বিয়োগ, শেষে মুক্তি। ইহাই দর্শন শাস্ত্রের শেষ সীমা।

তারপর বঙ্গে দুঃখের সময় আসিল—সনাতন ধর্ম্ম লুপ্ত হইল। রাজ পরিবর্ত্তন হইল—বিধর্ম্মিগণ প্রভু হইলেন। সবল, সচেষ্ট, তেজস্বী রাজনীতি বিশারদ আর্য্য-বীরদের মধ্যে বিলাস-প্রিয়তা সুখলিপ্সা ও ব্যভিচার প্রবেশ করিল। তখন বঙ্গ, বারবিলাসিনীদিগের মঞ্জীর নিক্কণে, স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের গতিতে ও প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে পরিপূর্ণ হইল। সাধারণে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই দুঃখের কালে দুঃখের গান গাহিবার জন্যই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির জন্ম।

চণ্ডীদাস এই দুঃখের গানে প্রেমের দুর্নিবার শক্তি দেখাইয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যের, অনন্ত প্রেমের রাজ্য সৃজন করিয়াছেন। আবার অনন্ত প্রেমের রাজ্যের সহিত বাস্তব জগতের মিলনে, বৈকুণ্ঠের সহিত সংসারের মিলনে, ভাবুকতার সহিত সংসার ধর্ম্মের মিলনে এই প্রেম-

গান সংসারের জিনিষ হইয়াছে। ইহাতে গার্হস্থ্য জীবনের নর-নারীর মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

"এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই।
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই॥
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা॥"

চণ্ডীদাসের এ প্রেমগান বৈকুণ্ঠের—রাধাকৃষ্ণের। হিন্দু সমাজ-নীতির বাহিরে—তাই প্রেমিক কবি ইহাকে সমাজ বন্ধন হইতে সুদূরে রাখিয়াছেন—বন্ধন বিহীন বৃন্দাবনের কুঞ্জের সহিত সমাজের কোন সম্পর্ক নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভালবাসার ধর্ম্ম—প্রেমের ধর্ম্ম। অনেকের বিশ্বাস পৃথিবীতে যীশুখৃষ্ট সর্ব্বপ্রথমে ভালবাসার ধর্ম্ম Religion of love প্রচার করেন। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবেরা ইহারই অনুকরণে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করেন। ফলকথা মেরীর খৃষ্ট হইতেই নন্দদুলাল যশোদার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। ইতিহাসের যখন জন্ম হয় নাই—পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যখন কোন সংবাদ পাওয়া যায় না—সেই দূর অতীতের ঘন অন্ধকারে এই ভারতেই সর্ব্বপ্রথমে ঋগ্বেদের ১ম সূক্তের ৯ম ঋকে অগ্নিকে পিতার ন্যায় আহ্বান করা হইয়াছে। আবার ১ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১০ম ঋকে বলা হইয়াছে "তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন, তুমি আমাদের পিতা, তুমিই বয়স্কৃৎ; আমরা তোমার সন্ততি বর্গ।"

তারপর বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ ভাব—মধুর ভাবের প্রথম প্রচার ৬২ সূক্তের ১১শ ঋকে দেখিতে পাই। সতী স্ত্রীর স্বামীলাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রেমের গভীরতা দেখান হইয়াছে। যিনি উপনিষদে "রসঃ বৈ স." যিনি বেদান্তে "আনন্দং ব্রহ্ম", তিনিই চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ব্রজলীলার প্রকাশের জন্য, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য ও সাধুগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ধরায় মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার।

"এতেবাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্।"

বৈষ্ণব কবিরা

"কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কেহ কহে পরব্যোম নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণ যাতে অবতারী॥"

আর রাধাঠাকুরাণী পূর্ণশক্তি—রাধাকৃষ্ণ এক বস্তু। শ্রীভগবানের এক অংশের নাম শ্রীকৃষ্ণ ও অপর অংশের নাম শ্রীরাধা। শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ণ, আবার শ্রীকৃষ্ণ বিহনে শ্রীরাধাও অপূর্ণ।

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

পাঠক! কনক অমরাবতীতে সুরপতির বামে শচী দেবীকে দেখিয়াছেন, কৈলাসে ভিখারী ভূতনাথের বামে জগতের অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণাকে দেখিয়াছেন, অযোধ্যার ধনুকধারী রামচন্দ্রের বামে আজন্ম দুঃখিনী সীতা দেবীকে দেখিয়াছেন, তাপস সত্যবানের বামে সতী সাবিত্রীকে দেখিয়াছেন, আরও কত শক্তির কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী শক্তি ব্রজের শ্রীরাধার মত অন্য কোথাও দেখিয়াছেন কি? এই শক্তির সহায়ে ভক্তগণ ভগবানকে পরমাত্মীয়ের মধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন—এই শক্তির বলে ভগবান ভক্তের সহিত অকপটে মিলিত হন। এই শক্তির বলে ব্রজের গোপবালকগণ অর্দ্ধভুক্ত ফল লইয়া ভগবানকে বলিয়াছিলেন,—"কাঁচামিঠে ফল খাওহে কানাই।" আবার ভগবান এই মধুর শক্তির লীলা দেখাইবার জন্য—ভক্তের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য স্বহস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়াছিলেন। এই মধুর মধুর অতি মধুর শক্তি সহ ভগবানকে আদর্শ করিয়া বেণ্যাদাস বিল্বমঙ্গল অন্তিমে প্রবল উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের আবেগভরে গাহিয়াছিলেন ঃ—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

ভক্তগণ এই শক্তির প্রভাবে দুঃখের দিনে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া শ্রীচরণে আশ্রয় লয়, আবার সুখের দিনে আনন্দে অধীর হইয়া শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া লয়। ফলতঃ যেখানে ব্রজের মধুর হইতে মধুরতম শক্তি শ্রীরাধিকা বর্ত্তমান, সেখানেই মধুর ভাব বিদ্যমান।

রাধাকৃষ্ণের মিলন প্রেমের মিলন। আমাদের প্রেমিক কবি এই প্রেমের মিলনই বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা ভক্তের ভাব লইয়া চণ্ডীদাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর প্রেমলীলা রসাস্বাদনে পবিত্র প্রেম প্রবাহে ভাসিয়া যাইবেন। আর যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র নহে, তাঁহারাও চণ্ডীদাস অনুশীলনে সহৃদয় ও প্রেমিক হইবেন। কারণ পবিত্র প্রেমস্পর্শে প্রস্তরতুল্য কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ এই পবিত্র প্রেমে কামের গন্ধ পান—তাই তাঁহারা পবিত্র ভক্তি-তত্ত্বের মধ্যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দেখিতে পান।

বৃন্দাবনলীলা (ভগবল্লীলা) বুঝিবার অধিকার ব্রহ্মজ্ঞানের পর জন্মে। প্রথমে ব্যতিরেকী সাধনায় জগৎ বস্তুশূন্য হয়, তারপর অন্বয়ী সাধনার ফলে জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া উঠে—তখন সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়—তখনও কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ মাত্র। তারপর যখন মানব সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া, শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া আপন চিত্তপটকে অখিল-নিরঞ্জনের বর্ণে অনুরঞ্জিত করিতে পারে, তখনই সে ভগবল্লীলা দর্শন করিতে পারে তখনই সে বুঝিতে পারে যে বৃন্দাবনলীলার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের চণ্ডীদাস এই লীলা অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া, আত্মাতে সম্ভোগ করিয়া অপরের আস্বাদনের জন্য ভাষায় গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন---তাই চণ্ডীদাসের পদাবলী সত্য ও বাস্তব।

স্বামী বিবেকানন্দ গোপী প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন :---“প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি, তখনই, কেবল তখনই, তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা কারই

উচিত নয়। যত দিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, তত দিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতিমুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্‌বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়। কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যেই যে এই গোপী প্রেম শিক্ষা। এমন কি দর্শন শাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর রসাস্বাদের উন্মত্ততা ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরু শিষ্য, শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে, আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারে আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্ব্ব প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্য্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা।"

কিন্তু এই পবিত্র গোপীপ্রেমে অনেকে অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়জাত কাম দেখিতে পান। পাঠক! প্রেম ও কামের পার্থক্য একবার দেখুন ঃ—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল॥

লোক ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্য পথ নিজ পরিজন।
স্বজন করায় যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥"

অধঃপতিত আমরা প্রেমের মূল্য বুঝি না। পৃথিবীর মধ্যে প্রেম বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ আসন বঙ্গ কবিই পাইয়াছেন। হায়, আজ আমরা স্বর্গীয়, আনন্দময়, মধুর, পবিত্র প্রেমে ইন্দ্রিয়পঙ্কিল অনিত্য কামের গন্ধ পাই।

পবিত্র প্রেমের পূর্ণ আদর্শ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এই প্রেমে রাগ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, ঘৃণা নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই। আছে কেবল সেই মধুর মধুর বড়ই মধুর—সেই নূতন নিতুই নূতন—সেই আপন আপন সদাই আপন ভাব। এই পবিত্র প্রেমের আদর্শ লইয়া বেশ্যাপরায়ণ বিল্ব-মঙ্গল প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন, আবার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত বালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদ জগতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি, আবার ঐতিহাসিক যুগে এই আদর্শ লইয়া দয়ার ঠাকুর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দিব্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া বঙ্গদেশ প্রেমরসে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই আদর্শে আত্মহারা মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনের বনে বনে "অয়ি দীন দয়াদ্রনাথ হে" বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন। এই আদর্শের ক্ষীণ আলোক হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্গগগনে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ছিলেন। বর্ত্তমান কালে উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া পাষণ্ডেরা দুই তিনটী বৈষ্ণবী লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চভাব নষ্ট করিতেছে। আজকাল সাধারণে বৈষ্ণব অর্থে "নেড়া-নেড়ির" অথবা "কর্ত্তাভজার" দল বুঝিয়া থাকেন। * তাই আমরা "বৈষ্ণব চণ্ডীদাস" অথবা "রামীর প্রেম" বলিলে বিকৃত অর্থে গ্রহণ করি। লীলাবতার চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ভক্তিমার্গের সুপ্রশস্থ, সহজ ও মহান্ পথ।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে 'অন্নং দেহি, ধনং দেহি, যশং দেহি' নাই, ভক্তগণ কেবলমাত্র শ্রীচরণ প্রার্থী—ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। + হৃদয়ে অনন্ত প্রেমের তরঙ্গ লইয়া, নয়নের অজস্র প্রেম প্রবাহে শ্রীপাদ ধৌত করিয়া তাহা সচন্দন তুলসী পত্রে সাজাইয়া "হা প্রাণকান্ত, হা হৃদয় বল্লভ" বলিয়া শ্রীপাদ পদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া লইতে চাহেন। বৈষ্ণবগণের নিকট মোক্ষ অতি তুচ্ছ, তাঁহারা মোক্ষের ধার ধারেন না—কেবল-মাত্র শ্রীপদে আত্ম সমর্পণ করিয়া শ্রীচরণ সেবা করিতে চাহেন—

* মুসলমানদের অত্যাচারে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মেও নানা আবর্জ্জনা প্রবেশ করে। বর্ত্তমান কালে সেই সব আবর্জ্জনাকেই লোকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বৈষ্ণবের চিত্র আঁকিত করিবার সময় এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

+ বৈষ্ণবদিগের মতে কৃষ্ণ কামনা কাম নহে।

"অকামো কৃষ্ণ কামো বা।"

আর দূর হইতে মন প্রাণ নয়ন পথে শুধু আশা মিটাইয়া রূপ সুধা পান করিতে চাহেন। * তাঁহারা

"ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি॥"

ধর্ম্ম জগতে ইহা এক নূতন তত্ত্ব; ভয়ের ধর্ম্ম বা কামনার ধর্ম্ম ইহার নিকটে স্থান পায় না। বৈষ্ণবেরা ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান, মঙ্গলময়, সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে চাহেন না, তাঁহারা কেবল তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া জানেন। তাঁহাদের অন্তিম প্রার্থনা—চরম আকাঙ্ক্ষা—শেষ নিবেদন:—

"বধুহে কি আর কহিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥"

সনাতন সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভক্তিমার্গে

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চনং চন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

সাধন করিতে হয়। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী উক্ত শ্লোকটীর দীর্ঘ টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—প্রথমে নাম শ্রবণ। নাম শ্রবণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ শ্রবণ করিতে হইবে। শুদ্ধান্তঃকরণে রূপ শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে রূপের উদয় হইবে। রূপের উদয় হইলেই গুণের স্ফুরণ হইবে। তাহার পর

---

* সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা ৩।২১

পরিকর। এই প্রকারে নাম রূপ গুণ ও পরিকর স্ফুরিত হইলে লীলার স্ফুরণ সম্যক্ রূপেই হইবে।

তৎপরে কীর্ত্তন। কিন্তু কীর্ত্তনের অধিকার সকলকে দেওয়া হয় নাই। যাঁহাদের মন নামাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত, কেবল তাঁহারাই নাম গ্রহণ করিতে পারেন। নামাপরাধ এই :—

১। সতাং নিন্দা—সাধু জনের নিন্দা।

২। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাচ্ছি বনামাদেঃ স্বতন্ত্র্য মননং—বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির নামকে স্বতন্ত্র মনে করা।

৩। গুর্ব্ববজ্ঞা—গুরুর অবজ্ঞা।

৪। শ্রুতি তদনুগত শাস্ত্র নিন্দন—শ্রুতি ও তাহার অনুগত শাস্ত্র-নিন্দা।

৫। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমিতি মননং—মানবের নাম গ্রহণের জন্য শাস্ত্রে নাম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে মনে করা।

৬। তত্র প্রকারান্তরেণ অর্থ কল্পনং—অন্য প্রকারে নামের অর্থ আবিষ্কার করা।

৭। নাম বলেন পাপ প্রবৃত্তি—নামে উদ্ধার পাইব বলিয়া পাপে প্রবৃত্ত হওয়া।

৮। অন্য শুভক্রিয়াভির্নামসাম্য মননং—অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সাম্য মনে করা।

৯। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি নামোপদেশঃ—শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ ও অনিচ্ছুকদিগকে নাম উপদেশ দেওয়া।

১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রুতেঽপ্য প্রীতি :—নাম মাহাত্ম্য শ্রবণেও অবিশ্বাস।

এই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি॥"

পাঠক! এরূপ ভাবে ঈশ্বরের নাম গ্রহণের ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিয়াছেন কি? একবার এরূপ ভাবে নাম লইতে পারিলে আর বাকী থাকিল কি?

ভক্তির এই নয় অঙ্গের সম্যক ও বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা ইহাতে চিত্তের ক্রমবিকাশ স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি। আবার এই ভক্তির নয় অঙ্গ পরস্পরের সহিত এরূপ নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ যে কোন একটী অঙ্গ অনুশীলন করিলে অন্যান্য গুলি নিজেই আবির্ভূত হইবে। পরীক্ষিত শ্রবণে, ব্যাসপুত্র শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মীপাদ সেবনে, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রুর বন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, বলি আত্মনিবেদনে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া ছিলেন।

চণ্ডীদাস ভক্ত—সহজ ভক্ত। কৃত্রিম ও স্বার্থময় ভক্তির নাশে সহজ ভক্তির উদয় হয়।

"তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে।"

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ ভব বৈয়াসকি কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতি র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরাম্॥

বর্ত্তমান কালে এই 'সহজ' দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের প্রেমিক কবি এই সহজ বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলি যে কায়।
কেমন বরণ কিসের গঠন
বিবরিয়া কহ তায়॥
শুনি নন্দসুত কহিতে লাগিল
শুন বৃকভানু ঝি।
সহজ পিরীতি কোথা তার স্থিতি
আমি না জেনেছি শুনেছি॥
আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গন্ধ পদ্ম হয়ে, কামের সহিতে
বেগেতে ধাইয়া গেল।
বিজুরী জিনিয়া বরণ যাহার
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে করয়ে উদয়
সে অঙ্গ করয়ে ভার॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাসে কহে ইহার উপরে
আর দেখ কিছু নাই॥"

বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভক্ত চারি প্রকার ঃ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

হনুমান প্রভৃতি দাস্য ভাবে, শ্রীদাম ও সুবলাদি সখাগণ সখ্যভাবে, নন্দ ও যশোদা বাৎসল্য ভাবে ও শ্রীরাধা ও ব্রজগোপীগণ শৃঙ্গার (মধুর) ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। *

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবে চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাবে সবে শ্রেষ্ঠ করি মনে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদন॥"

ভগবানকে প্রভু বলা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ভাব আছে—তাহা তাঁহাকে পিতা বা মাতা বলা। তদপেক্ষাও পবিত্র ভাব তাঁহাকে সখা বলা। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব তাঁহাকে প্রেমাস্পদ বলা—কারণ অন্যান্য রসের গুণ মধুর রসে দেখিতে পাওয়া যায়।

"শান্ত দাস্য সখ্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥"

মধুর ভাব বুঝাইবার সামগ্রী নয়—সাধনা দ্বারা বুঝিতে হয়। এই মর জগতে দাম্পত্য ভাবে কতকটা মধুর ভাবের আভাষ পাওয়া যায়।

পত্নীও

"ক্রোধে দাসী, রতৌ বেশ্যা, ভোজনে জননী সমা।
বিপত্তৌ মন্ত্রণাদাত্রী * * * * ॥"

---

* গোপ্যঃ কামাদ্।—ভাগবত ৭।১।২৯

ব্রজগোপীরা কামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।

পল্লীতে সময় অনুসারে সমস্ত রসের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা মধুর ভাব নহে। যদি এই দাম্পত্য ভাবকে স্ত্রী-পুরুষ-স্মৃতি পৃথক করিয়া ঈশ্বরাশ্রিত করা যায়, তবে তাহাই স্বর্গীয় মধুর হইতে মধুরতম মধুর ভাবে পরিণত হইতে পারে। এই ভাবের পূর্ণ আদর্শ শ্রীরাধা। আনন্দচিন্ময়প্রেমরসবিশিষ্টা ব্রজগোপীরা এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের "মাথার মণি", তাই বিগণ বলিয়া গিয়াছেন :—

"ব্রজগোপিকাদিবৎ"—নারদ সূত্র।

ব্রজগোপীদের মতন ভ'ানকে ভজনা করিবে—ইহাই শ্রেষ্ঠ ভজন। স্বকীয়া ও পরকীয়া দু ভাবে শৃঙ্গার বিভক্ত। তন্মমধ্যে পরকীয়া ভাব বিষয় বিহীন কৃষ্ণময় ব্রজ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও দ্বারকার পট্ট-মহিষীগণের দাম্পত্যময় অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসের সহিত তুলনা দেওয়া হয়, কিন্তু স্বরূপশক্ত্যংশরূপিণী গোপিকাগণের উপপত্যময় শৃঙ্গার রস অধিক মধুর। *

"তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।

* স্বামী স্ত্রীর প্রেমকে স্বকীয় প্রেম কহে। স্বকীয় প্রেম বাধ্য বাধকতা সম্বন্ধ যুক্ত। আর বাধা বিপত্তি না মানিয়া যে প্রেমবলে মন স্বতঃই নিজ প্রাণনাথের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাকে পরকীয়া প্রেম বলে। পরকীয়া প্রেমে নায়ক নায়িকার কোন বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ বা অধিকার নাই। কুলটা রমণীর ন্যায় পরকীয়া প্রেমে ভক্ত নানা কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা প্রাণনাথের চরণ প্রান্তে পড়িয়া থাকেন—সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। ব্রজগোপীদের চরিত্রে এই ভাবের চরম স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

মধুর (শৃঙ্গার) রস ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—কেবল অনুভব করিতে হয়—সাধক ব্যতিত তথায় তোমার আমার প্রবেশাধিকার নাই। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস শৃঙ্গার রসের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥
কিশোর কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥"

যে রসিক সে-ই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে। চণ্ডীদাস এই তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, তাই আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই ;—

"সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন ॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ বোম আপ।
ষড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ ॥
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু ॥
মহদ্ভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ ॥
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি ॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মুণিপুর পরম শিবের স্থল ॥
নাসা মূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃদ-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে।
কুল কুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভিমূলে ॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥
ওস্থ পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ॥

লিঙ্গ মূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্য মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদ-পদ্ম দ্বাদশ দল কয়॥

সহস্র দল অষ্ট দল দেহ মধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়।
ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥

দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যে-স্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে॥
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্ট দল চক্রে লীলার সঞ্চার॥

দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চচক্রে পঞ্চবায়ুর সঞ্চার॥
প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান।
কণ্ঠাম্বুজা বধি চতুর্দ্দলে অবস্থান॥

কণ্ঠপরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সাধন॥
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্ব ভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥

অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥

প্রবর্ত্ত সাধন হৃদ-নাভি পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্ট দলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে॥"

চণ্ডীদাসের কবিত্ব ও কবিতা

বহিঃপ্রকৃতি হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে নানা রসে, নানা সুরে, নানা ভাবে ও নানা রংয়ে রঞ্জিত হইয়া বিশেষরূপে নিজস্ব আকার ধারণ করে, তাহাকেই সাহিত্য বলে। তাই সাহিত্যিকগণ ভাল মন্দ, ভয় বিস্ময়, সুখ দুঃখ, বিরহ, কাতরতা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তির দ্বারা ও কল্পনা-শক্তির সাহায্যে বাহিরের জগৎকে নিজের করিয়া লয়। আবার অন্তরে এই অপরূপ মানস জগৎ সৃষ্টি করিয়া রচনাশক্তির প্রভাবে বাক্য বিন্যাসে ছন্দে ও শব্দে রূপ দিয়া ও ব্যক্ত করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিয়া দেয়; তাহাই প্রকৃত কবিতা।

সাহিত্যের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাই হৃদয়ের ভাব জাগাইতে হইলে হৃদয় দান করিতে হয়; আবার হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়; এই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য সাহিত্যে অলঙ্কারের, রূপকের ও ছন্দের আশ্রয় লইতে হয়। ইহা ছাড়া আরও দুইটী প্রয়োজনীয় মূল্য-বান জিনিষ আছে,—চিত্র ও সঙ্গীত। ভাষার মধ্যে হৃদয়ের ভাব-গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সঙ্গীত ও চিত্র প্রধান উপকরণ; কারণ শব্দের মধ্যে কাতরতা, ব্যাকুলতা ও গভীরতা সঞ্চার করিতে সঙ্গীতই একমাত্র উপায়। একটা সামান্য শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে কিছুই বিশেষত্ব পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই শব্দটী সঙ্গীতের দ্বারা অসামান্য হইয়া উঠে—সমস্ত জগৎ অনুসন্ধান করিলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ পাওয়া যাইবে না।

কবিতার লক্ষ্য হৃদয় অধিকার। কবি আনন্দময়ের আনন্দ নিকেতন হইতে সৃষ্ট আনন্দরাশি লইয়া সেই আনন্দ রাশির প্রতিধ্বনি করেন; আর যতই সেই প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়বীণার ঝঙ্কারের সহিত মিলিত হয়—ততই আমরা মোহিত হই। এই কার্য্য সাধনের জন্য কবি সমাজের উপযুক্ত করিয়া আদর্শের সৃষ্টি করেন এবং নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলেন। সময়ে সময়ে হৃদয়ের করুণা উন্মেষ করিবার জন্য দুঃখের চিত্রের অবতরণা করিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পৃথিবীর সাহিত্যের সহিত আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে প্রভেদ আছে। অন্যান্য সাহিত্যে দুঃখকে মূর্ত্তিমান করিয়া কেবল নিষ্ঠুরতা বা বর্ব্বরতাকে আরও জাজ্জ্বল্যমান করে—ইহাতে কেবল পশুভাব লক্ষিত হয়,—ইহা পশু জগতের কথা। আর আমাদের সাহিত্যে চিত্তকে উন্নত করিবার জন্য দুঃখের অবতরণা করা হয়। তাই আমরা আমাদের সাহিত্যে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা আর্থারের চক্ষু উৎপাটন, হ্যামলেটের পিতার নৃশংস হত্যা ইত্যাদি চিত্রের পরিবর্ত্তে রামের বনবাস, সীতার বর্জ্জন, মাথুর বর্ণিত দুঃখ, সাবিত্রীর কষ্ট, যুধিষ্ঠির বা ভীষ্মের ত্যাগজনিত দুঃখ দেখিতে পাই। এ সব দুঃখে উচ্চতর কর্ত্তব্যের আহ্বান দেখিতে পাই—ইহাতে প্রেমের আদর্শকে সজাগ করিয়া দেয়—ইহা মহৌষধের ন্যায় চিত্তকে সবল ও সতেজ করে।

কাব্যের বিশেষত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে রস, ভাব, রচনা, অলঙ্কার, রীতি, ছন্দঃ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হয়। আমরা একে একে চণ্ডীদাসের অতুলনীয় কাব্যে ছন্দাদির বিষয় আলোচনা করিব।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন আলঙ্কারিক "কাব্যাদর্শ" প্রণেতা দণ্ডী রচনা রীতি

দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—"বৈদর্ভী" ও "গৌড়ী" রীতি। পাঞ্চাল রাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে "পাঞ্চালী" রীতি প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্ত্তী কালে সাহিত্যে আরও একটী রচনারীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা "লাটী" নামে প্রসিদ্ধ।

মাধুর্য্যগুণের ব্যঞ্জক শব্দ বিন্যাসই "বৈদর্ভী" রীতির পরিচায়ক। ইহা কেবল কোমল, কান্তপদ; রচনা সরল, তরল ও শীতল। অনুপ্রাস ও সুদীর্ঘ সমাস বহুল ওজোগুণের ব্যঞ্জক রচনা পদ্ধতিই "গৌড়ী" রীতি। ইহাই খাঁটী বাঙ্গালা—ওজস্বিনী, আড়ম্বরময়ী, "দম্পন-কম্পন দাপট-চাপট" যুক্ত। "পাঞ্চালী"—রীতির নিজের কোন বিশেষত্ব নাই—ইহা "বৈদর্ভী" ও "গৌড়ীর" মধ্যবর্ত্তিনী। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় রীতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুকুমার গুণের পরিচায়ক শিথিল বন্ধ অথচ লালিত্য সম্পন্ন শব্দ বিন্যাসকে "লাটী" রীতি কহে। লাটী এক প্রকার "বৈদর্ভী"র নামান্তর মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে উদ্ভূত ও প্রচলিত লিখনভঙ্গী প্রাদেশিকতা সূচক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইহাই সাধারণ বিভিন্ন পদ্ধতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা বিদর্ভদেশ-বাসী ভবভূতির "গৌড়ী" রীতির, ভিন্নদেশবাসী কালিদাসের বৈদর্ভী" রীতির এবং মাঘ, ভারবি, ও ভট্টির প্রধানতঃ "পাঞ্চালী" রীতির অনুসরণ প্রায় দেখিতে পাই। আমাদের বঙ্গীয় কবি চণ্ডীদাসও "গৌড়ী" রীতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কাব্যের উপযোগী, মধুর প্রাঞ্জল "বৈদর্ভী" রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস সুবিবেচনার সহিত তাঁহার কবিতায় অসংখ্য ছন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ, উৎকৃষ্ট ও সুশ্রাব্য ছন্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন। পদাবলীতে যে

সকল সুমধুর ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মধ্যে পয়ার ও ত্রিপদী প্রধান। আমরা এই দুইটী ছন্দঃ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন যে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক হইতে বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি। কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ার মাত্রাবৃত্ত। তাঁহার মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পজ্ঝটিকা ছন্দঃ প্রথম প্রচলিত হয়। এই "পজ্ঝটিকা" ছন্দঃ হইতেই পরবর্ত্তীকালে সুপ্রসিদ্ধ চৌহান নৃপতি পৃথ্বীরাজের সভাসদ কবিচাঁদ বরদাই স্বরচিত—"পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক গ্রন্থে ব্যবহৃত, ষোড়শ মাত্রিক চোপাই ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত "চতুষ্পদী" শব্দের অপভ্রংশ—'চ-উপাই', 'চৌপাই' হইয়াছে। * এই সব ছন্দঃ একদিনে হয় নাই—ক্রম পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে 'চৌপাইর' সহোদর বাঙ্গালা "পয়ার" ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, এই পয়ারের প্রথম প্রবর্ত্তক কবি চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসের সময়ে পয়ার সম্পূর্ণ অক্ষর বৃত্ত ছন্দে পরিণত হয় নাই—তখন মাত্রা-বৃত্ত ছিল। তাই আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অক্ষরের সংখ্যা ঠিক দেখিতে পাই না—কিন্তু তাই বলিয়া পদাবলীতে কোথাও ছন্দঃ পতন হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। যথা :—

"সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥"

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩২৮ সাল।

অন্যত্র—

"ঐ ছন শুনইতে মুগধ রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত বয়না॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণে কহইতে প্রিয়তম ভাষ॥
কহইতে না কহসি রজনীক কাজ।
আমার শপথি তোরে যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগমে হইল যত সুখ।
পুনহি মিলনে পাওব কত সুখ॥
ঐছন বচন শুনি কহে মৃদু ভাষি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি॥"

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পয়ার চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে. অক্ষর বৃত্তের নিয়মানুসারে ১১ অক্ষরী পয়ার দৃষ্ট হয়। যথা:—

"রজনী-বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলসভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোড়ে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে বুক।
দেখি সখি কহে কহ না দুঃখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥"

বাঙ্গালা পয়ারের ন্যায় ত্রিপদীও মাত্রা-ছন্দ হইতে উৎপন্ন।

"থীর বিজুরী বরণ গোরী
পেখিনু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে॥" ইত্যাদি

পদটী ২০ অক্ষরী লঘু ত্রিপদী। উদ্ধৃত পদটিতে প্রথমে ১৮ অক্ষরের ব্যবহার থাকিলেও শেষে ২০ অক্ষর দেখা যায়।

"চরণ কমলে মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাস হৃদয় উল্লাস
পালটী হইবে দেখা।"

এই পদটী প্রথমে মাত্রা পরে অক্ষর-বৃত্তের নিয়মানুসারে রচিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা আধুনিক অক্ষর-বৃত্তের নিয়মে রচিত দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

এই ছন্দের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক জয়দেব। প্রাচীন সংস্কৃত কবি কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতির কাব্যে কোথাও এই ছন্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা এই ছন্দের প্রথম ব্যবহার জয়দেবের কোমল-কান্ত পদাবলীতে দেখিতে পাই।

পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে লঘু চৌপদীর একটী পদ পাইয়াছি। যথা :—

"(ঘন) শ্যাম শরীর
কেলি রস
যমুনক তীর
বিহার বনি।

শ্রীদাম সুদাম
ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম
রঙ্গে কিঙ্কিনী ॥" ইত্যাদি।

এইবার আমরা চণ্ডীদসের রুচি সম্বন্ধে বলিব। এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে অশ্লীলতা দেখিয়া থাকেন। কিন্তু স্বভাব কবি চণ্ডীদাসের কবিতা ইন্দ্রিয়জাত হইয়াও অতীন্দ্রিয়; ইহা বিলাস-শূন্য ইন্দ্রিয়ের সংস্রব-শূন্য, ও বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। যদিও স্বয়ং দৌত্য, খণ্ডিতা প্রভৃতিতে বিলাস-প্রিয়তা লক্ষিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীমতীর অনুরাগের পদগুলি বিলাস-বাসনা-শূন্য ও আধ্যাত্মিক জগতের বহুমূল্য সম্পদ।

সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মেঘদূতের একটী কবিতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—"ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবিতা এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক।" আমরাও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলি, "চণ্ডীদাস অশ্লীল নহে,—পাঠকের হৃদয় নরক।"

যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও তাঁহার কবিতায় তথাকথিত অশ্লীলতা দেখিতে পাইবেন না। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে ও সংস্কৃত সাহিত্যে কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘ, অমরু-শতক, গাথা সপ্তশতী, আর্য্যা সপ্তশতী প্রভৃতির বহুস্থান চণ্ডীদাস অপেক্ষা বহু পরিমাণে তথাকথিত অশ্লীলতা দোষ-দুষ্ট। ইংরাজি সাহিত্যে চসার, সেক্সপীয়র, বেন জনসন্, বোমেণ্ট ফ্লেচার,

মিলটন, উইচারলি, কনগ্রিভ, বাইরণ প্রভৃতির কাব্যে স্থানে স্থানে যে সকল লজ্জাজনক বর্ণনা বা উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা চণ্ডীদাসে রুচি যথেষ্ট বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। মোট কথা অতি পূর্ব্বে কাব্যে নৈতিক বিশুদ্ধি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না।

চণ্ডীদাস কবি—বঙ্গের আদি কবি। কবিত্ব শক্তি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ; কিন্তু বাগ্দেবী চণ্ডীদাসকে এই দুর্ল্লভ শক্তি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালীর "মোটা ভাত ও কাপড়ের সোঁদা গন্ধ" পাওয়া যায়, তাই পাগলা চণ্ডীর প্রেমের গানে আমরা নিজের নিজস্ব অনুভব করি—আমরা আমাদের হৃদয়ের কথা শুনিতে পাই। তাই এই প্রেমের গান বাঙ্গালার আপামর সাধারণ—সকলের উপভোগের বিষয়। এই চির পুরাতন প্রেমের গানের মধ্যে যে ব্যাকুলতা যে গভীরতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে, তাহা আর পৃথিবীর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। "সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য ঘাটিলেও যাহার একটী অশ্রুর মূল্য হইবে না, যাহার কতিপয় অশ্রুজল সিক্ত পদ কুসুমের সুরভির ন্যায় প্রকৃতি আপনা আপনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষণ আবশ্যক হয় নাই,—যিনি গীতি কবিতায় সরল অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষ মিশ্রিত প্রেমের কথা গাঁথিয়া গিয়াছেন—কাব্যক্ষেত্রে সেই চণ্ডীদাস প্রভু কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার।" *

চণ্ডীদাসের তুলনা চণ্ডীদাস। গম্ভীর ও ব্যাকুল চণ্ডীর সহিত

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

নবীন ও মধুরতাময় বিদ্যাপতির তুলনা হইতে পারে না। শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীর তুলনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন ঃ—"গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তি সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক। এই জন্য ছন্দঃ, সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙ্গে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এই জন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য সুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গ লীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সঙ্গীত ধ্বনি। দুঃখ নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সুখ দুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল ব্যবধান আছে। হয় সুখ, নয় দুঃখ ; হয় মিলন, নয় বিরহ ; এইরূপ পরিষ্কার শ্রেণী বিভাগ। চণ্ডীদাসের মত সুখে দুঃখে, বিরহে মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেই জন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।"

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে উপমা প্রয়োগ দেখা যায় না ; কিন্তু আমরা চণ্ডীদাসের প্রথম লিখিত "কৃষ্ণ কীর্ত্তনে" শব্দ যোজনার একটু পারিপাট্য ও উপমার বাহুল্য দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হইল।

"সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামান সদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল॥

---

* সাধনা, ১২৯৮ চৈত্র, ৪০৭ পৃঃ।

ওষ্ঠ অধর যেহু যমজ পোআর।
করযুগ শোভে যেন বরুণের জাল॥
ভুজযুগ করিকর জনুত লুসে।
করঙ্গ রুবিন্দ-মাল নির্ম্মিত কমলে॥
মরকত পাট সদৃশ বক্ষঃস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল॥"

কিন্তু পরিণত বয়সে কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল ও আত্মাহারা চণ্ডীদাসের ভাষা সরল, তরল, অলঙ্কারাদির বন্ধনমুক্ত হইয়া অধিকতর সুললিত ও কোমল হইয়াছিল। "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই,—সুন্দরের স্বভাব-ভঙ্গীই গহনা হইতে বেশী আকর্ষক, উপমা কবির একটী শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য—কিন্তু বিল্পি ভাবটী নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না. তিনি উপমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে গৌণ বস্তু দ্বারা মুখ্য বস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা হইতে জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট।"

চণ্ডীদাসের প্রেম-চিত্র অতি প্রকৃত, অতি অলৌকিক; তাই সাধন ভজন না জানিয়াও কাব্য রস আস্বাদন করিতে পারা যায়। কাব্যের হিসাবে চণ্ডীদাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাসের সৃষ্টি অদ্ভুত, অতুলনীয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে শ্রীরাধার মতন নায়িকা ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মতন প্রেম দেখিতে পাওয়া যায় না। মিরান্দা, ডেসডিমানা, জুলিয়েট প্রভৃতি নায়িকারা শ্রীরাধার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে জুলিয়েট

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

প্রেমিকার শিরোমণি; জুলিয়েট রোমিওকে বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন :—

"Good Night. Good Night. Partinz is such good sorrow
I'll say good Night, till it be morrow."

আর আমাদের চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের মথুরা গমন শুনিয়া বলিয়াছির্লেন :—

"হিয়ার মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দির গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বধু পালাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে, বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥"

পাঠক দেখিবেন, জুলিয়েটের প্রেম রাধার প্রেমের তুলনায় অতি অকিঞ্চৎকর; রাধ'র প্রেমে আমরা বাস্তব জগতের প্রেমের অদ্ভুত মাধুরী ছাড়া ভগবদারাধনার সূত্র দেখিতে পাই।

চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবিরা তাঁহার অমৃতময় কবিতা অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসকে 'রসশেখর' উপাধি দিয়াছিলেন।

"জয় জয়দেব কবিনৃপতি, শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর, অখিল ভুবনে অনুপম॥"

বৈষ্ণব দাস

চণ্ডীদাসের প্রেমের গীতাবলী পাঠে কবি নরহরি লিখিয়াছেন :—

"জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ণ গায়ত জগৎ জনে॥
বিপ্র কুলোদ্ভব ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দদাতা।
যার তনু-মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥

* * * * * * *

চণ্ডীদাস পদে যার রতি সে পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহ দাস নরহরি ভণে॥"

কবি গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণিগণ, শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে, হীন আকিঞ্চনে, করুণা করি পুরব আশা॥"

চণ্ডীদাসের বিষয়ে কবি প্রসাদ দাস লিখিয়াছেন :—

"কিবা অপরূপ, কবিতা মাধুরী,
আখর পিরীতি মাখা।
অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া
অনুপ বচন ভাখা॥
বরজ যুগল, পিরীতির খনি
সে মুখ শরদ শশি।
কবিতা পঠনে, হেন লয় মনে
চিত যায় যেন খসি॥
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি
গাইলা সে কবি চন্দ।

রস কবি কুল, মত্ত মধুকর,
পিয়ে ঘন মকরন্দ ॥”

কবি কানু দাস চণ্ডীদাসের কবিতার সমালোচনায় বলিয়াছেন :—

“কবি কুলে রবি, চণ্ডীদাস কবি,
ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক
সাধকে সাধক গণি ॥
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষায় লালিত্য
ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে
উভয় অধীন যেন ॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল,
প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে,
শুনা মাত্র আত্মহারা ॥”

চণ্ডীদাসের কবিতা পাঠে কবি রাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন :—

“মরি মরি কি রীতি—পীরিতি রস শশধর
তারা সহ রস কো করু তর।
বিরচয়ে ললিত গীত শুনইতে ইহ
অখিল ভুবন-নরনারী বিভোর ॥
রসিক সকল সহ সংকীর্ত্তন রত
রাধামোহন চিত উমতায়
বিদিত রচিত চিত্র ভণ নরহরি
পামর মন কি রহব তছু পায় ॥”

বাস্তবিক প্রেমিক চণ্ডীদাসের কবিতা পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দ রসে প্লাবিত হইয়া যায়। বঙ্গভাষার শৈশবাবস্থায় চণ্ডীদাস লীলা সাঙ্গ করিয়া ত্রিদিব ধামে গমন করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভূমে যত দিন এক জন বঙ্গবাসী থাকিবেন, তত দিন চণ্ডীদাসের প্রতিষ্ঠিত অক্ষয় স্মৃতি স্তম্ভ-তুল্য তদীয় কবিতাবলী বিদ্যমান থাকিবে। ভক্ত ও প্রেমিক চণ্ডীদাস,—বঙ্গবাসীর গৌরবের চণ্ডীদাস, তুমি তোমার চিরবাঞ্ছিত গোলক ধামে অনন্তকাল সুখে অবস্থান কর; যেখানে

"শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইবে তাহার প্রজা,
ডুবিবে রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিবে।
শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে, আনন্দে কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পায়॥"

চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ।

——:০*০:——

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর সর্ব্ব-দেশেই সর্ব্ব প্রথমে কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গদেশে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই; অতি পূর্ব্বে বঙ্গ কবিরা অমৃতময়ী ভাষায় রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে চণ্ডীদাসের সময়ে গদ্যও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানেও চণ্ডীদাসের লিখিত কোন গদ্য রচনা পাই নাই;- তবে তাঁহার পদাবলীতে দুই এক স্থলে গদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, চণ্ডীদাসের কবিতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহার কবিতাগুলি কীর্ত্তনের জন্য রচিত। কীর্ত্তন ভাব গঠনের সহায়তা করে। ভাব গোলোকে যাইবার একটী পথ; তাই প্রেমিক কবি প্রথমে ঈশ্বরারাধনার প্রথম সোপান স্বরূপ কীর্ত্তন গানে তন্ময় থাকিতেন।

কীর্ত্তনের গানগুলি শৃঙ্গার (মধুর) রসের অন্তর্গত। এই শৃঙ্গার আবার ৬৪ বিভাগে বিভক্ত। স্থানাভাব বশতঃ আমরা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত থাকিলাম। কেবল পাঠকের অবগতির জন্য বিভাগগুলি দিলাম।

শৃঙ্গার রস দুই ভাগে বিভক্ত :—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ *। বিপ্রলম্ভ

---

* এক সে শৃঙ্গার রস দুই ভেদ তান।
এক বিপ্রলম্ভ আর সম্ভোগ আখ্যান॥

উজ্জ্বল রস সার সংগ্রহ।

আবার চারি ভাগে বিভক্ত যথা :—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য ও প্রবাস *। পূর্ব্বরাগ নায়ক ও নায়িকা ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে নায়িকার পূর্ব্বরাগ প্রথমে বর্ণনা করিতে হয় †। কিন্তু শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ‡। প্রাচীন পদসংগ্রাহকগণের পন্থা ও বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণের মত অনুসরণ না করিয়া তিনি বলেন "আমি যে সাহস করিয়া এই শাসন-বাক্য মানি নাই, তাহার কারণ বলিতেছি। চণ্ডীদাসের সময় বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্র রচিত হয় নাই। সুতরাং চণ্ডীদাসের পদ-সংগ্রহ ও ক্রমনির্দ্দেশের সময় উক্ত শাস্ত্র যে মানিতেই হইবে, এমন বলা যায় না।" কিন্তু আমরা অন্যরূপ মনে করি। যেরূপ প্রথমে ভাষা সৃষ্টি হইয়া পরে ব্যাকরণের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ বৈষ্ণব অলঙ্কারের পূর্ব্বে বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী

* পূর্ব্বরাগ স্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
উজ্জ্বল রস সার সংগ্রহ।

† অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাচ্চারুতাধিকা॥
উজ্জ্বল নীলমণি।

‡ বাজারে যতগুলী চণ্ডীদাসের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটীতেই, সূক্ষ্ম বিভাগ ও পদ বিন্যাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও, রসপর্য্যায়ানুসারে বিভাগ করা হয় নাই। উক্ত গ্রন্থকারগণ এ বিষয় বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু নীল-রতন বাবু এজন্য একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন; কাজেই তাঁহার কথা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

কালে সকলকেই সেই বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা সাহিত্যে একটা যথেচ্ছাচারিতার সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। চণ্ডীদাসের পরে অলঙ্কার শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, চণ্ডীদাস সে শাসন-বাক্য মানিতে পারেন না; তিনি যদি নিজে পদের শ্রেণী বিভাগ করিতেন, তাহা হইলে যাহাই হউক না কেন আমরা তাহা মাথায় তুলিয়া লইতাম। ইহা ছাড়া আর এককথা বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ না করিলে রসভঙ্গ হয়, অর্থাৎ চরিত্র স্ফুরণের ধারা ভঙ্গ হইয়া যায়।

নীলরতন বাবুর দ্বিতীয় কারণ "শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমেই হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে কথাটী বিচার করিয়া দেখা যাউক। * * * আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দয়াল ঠাকুর। তিনি জীবকে আলিঙ্গন করিতে, কোলে টানিয়া লইতে সদাই ব্যাকুল। * * সাধারণ জীব সম্বন্ধে ভগবানের যে রূপ ব্যবহার, শ্রীরাধিকার সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কেননা, তাঁহারা লোক শিক্ষার জন্য, জগতে প্রেমতত্ত্ব প্রচারের জন্য বৃন্দাবনে ' অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্য আমি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমেই দিয়াছি। যাহা প্রকৃত ও স্বাভাবিক, তাহাই করিয়াছি মাত্র।" নীলরতন বাবু শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান ও শ্রীরাধাকে জীব ভাবে দেখিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥"

পুরাণকারের নিকট

"রেকোহি কোটী জন্মান্তং কর্ম্ম-ভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎ সৃজেৎ॥

ধকার ষায়যোর্হানি ষাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণ স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়॥"

"র্" শব্দে কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ ও শুভাশুভ কর্ম্মভোগ, "আ" শব্দে গর্ভবাস, মৃত্যু ও রোগ, "ধ্" শব্দে আয়ুর ক্ষয় এবং "আ" শব্দে সংসার বন্ধন। যাঁহার নাম শ্রবণে, স্মরণে ও কীর্ত্তনে এই সকল বিনষ্ট হয় তিনি রাধা। ধাতু গত অর্থে রাধাই বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি—সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী শক্তি। কারণ "রাধ্" ধাতুর অর্থ নিষ্পন্ন করা। যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সকল বিষয় নিষ্পন্ন হয় তাহাই রাধা।

জীব হিসাবে বিচার করিতে হইলে শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকেও জীব ভাবে দেখিতে হইবে; তাহা হইলে সমাজ বন্ধনের মধ্যে আসিয়া পড়ে। সমাজের নিয়মানুসারে অস্মদ্দেশে নায়কের বহু পত্নীত্ব অবস্থা বিশেষে দুষনীয় নহে, কিন্তু নায়িকার কায়-মনো-বাক্যে সতীত্ব অপরিহার্য্য। নায়িকার মনোগত ভাব না জানিয়া যদি নায়ক তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং সেই নায়িকা যদি পূর্ব্বে কাহাকেও হৃদয় সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের মতে এক বীভৎস কাণ্ড উপস্থিত হয়; কারণ পর-স্ত্রী বা পরানুরক্তার প্রতি নায়কের অনুরাগ নিন্দনীয় এবং রাবণাদির ন্যায় নিন্দনীয় চরিত্রেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

সুসভ্য জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্মরণাতীত কাল হইতেই নারী সমধিক সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, অধিকন্তু ভারতীয় মনীষীগণ নারীপূজার প্রবর্ত্তন করিয়া প্রকৃতিকেই মহিমান্বিতা করিয়াছেন। সেই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কবিগুরু

কালিদাস বোধ হয় রঘুবংশের প্রথমে "পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধা হইতে রসের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রাধান্য দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও পাশ্চাত্য জগতে নারীর সম্মান যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; সে হিসাবে অন্ততঃ নায়িকার পূর্ব্বরাগ প্রথমে সন্নিবেশিত হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি। কাজেই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ 'খাম খেয়ালের' বশবর্ত্তী হইয়া বা কাব্য জগতে নূতন ভাব প্রচলনের জন্য নায়িকার পূর্ব্বরাগ আদৌ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

পূর্ব্বরাগ দর্শন ও শ্রবণ হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে দর্শন ৩ ভাগে ও শ্রবণ ৪ ভাগে বিভক্ত। দর্শন যথা :—সাক্ষাদ্দর্শন, চিত্রপটে ও স্বপ্নে দর্শন। শ্রবণ যথা :—বন্দি, দূতী, সখি ও গীত শ্রবণ *।

তারপর মান। মান দুই ভাগে বিভক্ত :—সহেতু ও নির্হেতু। সহেতু মান আবার তিন ভাগে বিভক্ত যথা :—শ্রবণ, অনুমিতি ও দর্শন। তন্মধ্যে শ্রবণ দুই ভাগে ও অনুমিতি তিন ভাগে বিভক্ত। শ্রবণ যথা :—শুকাদি পঠন ও প্রিয় সখী মুখে। অনুমিতি যথা :—ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন ও স্বপ্ন শ্রবণ। ভোগাঙ্ক আবার তিন ভাগে বিভক্ত যথা :—নিজগাত্রে, প্রিয়গাত্রে ও বিপক্ষ গাত্রে †।

---

* সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনং।
বন্দি দূতী সখী বক্ত্রাৎ গীতাদেশ্চ শ্রুতি ভবেৎ।

† সোঽয়ং সহেতু নির্হেতু ভেদেন দ্বিবিধোমতঃ।
শ্রুতংচানুমতং দৃষ্টং হেতুর্ঘেশিষ্ট্যং ত্রিধামতং।
শ্রবণন্তু প্রিয়সখী শুকাদিনাং মুখাদ্ভবেৎ।
ভোগাঙ্ক গোত্রস্খলন স্বপ্নৈরনুমিতিস্ত্রিধা।
ভোগাঙ্কো দৃশ্যতে গাত্রে বিপক্ষস্য প্রিয়স্য চ॥

প্রেমবৈচিত্র্যের কোন বিভাগ নাই। তারপর প্রবাস। প্রবাস দুইভাগে বিভক্ত—বুদ্ধি পূর্ব্বক ও অবুদ্ধি পূর্ব্বক। ইহা আবার কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত। সুদূর আবার তিন ভাগে বিভক্ত যথা :—ভাবি, ভবন ও ভূত। *

সম্ভোগ দ্বিবিধ প্রকার—গৌণ আর মুখ্য। জাগ্রদবস্থার সম্ভোগের নাম মুখ্য ও স্বপ্নে সম্ভোগের নাম গৌণ। ইহা আবার চারি ভাগে বিভক্ত যথা :—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। সম্পন্ন দুই ভাগে বিভক্ত—প্রাদুর্ভাব ও আগতি †।

ইহা ছাড়া প্রাচীন পদাবলীতে অষ্ট নায়িকা (অভিসারিকা, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীন ভর্তৃকা ও প্রোষিত ভর্তৃকা), দৌত্য (স্বয়ং দৌত্য ও আপ্তদূতী), প্রেমাদি মহাভাব, দশা ইত্যাদির পদ পাওয়া যায়। প্রাচীন পদ সংগ্রহকারগণ এই সব পদ গুলিকে ভাবানুসারে রস পর্য্যায়ের পূর্ব্বে বা পরে বিন্যাস করিয়া পদাবলীর মালা গাঁথিয়াছেন। এই নিয়মের ব্যক্তিক্রমে সংগৃহীত পদগুলি সংযোগ সূত্রহীন, রস ও ভাবের 'খিচুড়ী' হইয়া পড়ে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে স্বর্গের

সদ্বিধা বুদ্ধি পূর্ব্বঃ স্যাৎ থেবা বুদ্ধি পূর্ব্বকঃ।
কিঞ্চিদ্দূরে সুদূরেচ গমনাদপ্যয়ং দ্বিধা।
ভাবীভবনশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধা সতু কীর্ত্যতে।
মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধেরিতঃ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্নর্দ্ধি মাতাবিদুঃ।
দ্বিধাস্তাদোগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি সসঙ্গমঃ।

নিত্যানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পরতে পরতে ত্যাগের অমৃত প্রবাহ, আত্মহারা প্রেমের আত্মজ্ঞান শূন্যতা—ছত্রে ছত্রে প্রেমের সেই বিহ্বলতা, সেই একান্ত নির্ভরতা, সেই আত্মবলি, সেই উন্মাদ অবস্থা, সেই কাতর অশ্রুর উৎস বিদ্যমান। পূর্ব্বোক্ত বিভাগানুযায়ী চণ্ডী-দাসের পদগুলি সাজাইলে প্রথমেই

নায়িকার পূর্ব্বরাগ *

পাওয়া যায়। মিলনের পূর্ব্বে অনুরক্তিকে পূর্ব্বরাগ বলে। প্রেমিক কবি একেবারে প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার প্রেমময়ী মূর্ত্তি পাঠকের সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন। চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন :—

"বিষম বড়বা অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥"

কারণ

"বয়সে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥"

কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাধার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল; রাধা বলিতেছেন :—

"চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নাহি চিতে
এখন করিব কি?"

---

* রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদি যা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।

এইবার সাক্ষাদ্দর্শন। সে রূপ দেখিয়া কি কেহ স্থির থাকিতে পারেন ?

"হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান।"

সতীর পক্ষে স্বামীত্যাগ অসম্ভব ; কিন্তু কৃষ্ণদর্শনে তাহাও সম্ভব। ধ্রুব রাজ্য লাভের জন্য বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদর্শনের পর তাঁহার আজন্মবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা দূর হইল। আর আমাদের রাধা কৃষ্ণদর্শনে উন্মাদিনী হইলেন, প্রেমের পূর্ণ বিকাশ আমরা এইবার দেখিতে পাই। এখন রাধা কৃষ্ণনাম শ্রবণে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন :—

"সই ! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?"

নাম সকলেই শ্রবণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমময়ী রাধার

"কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥"

আর কি হইল ?

"না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

বদনের কার্য্য নাম উচ্চারণ করা,

শ্রীমতীর

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥"

শ্রীমতী রাধার বড় দায় হইল, বিস্মৃতির অতল জলে কৃষ্ণনাম নিক্ষেপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; কিন্তু

"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়?"

আর কি রক্ষা আছে? তন্ময়তা যোগের বীজ আজ শ্রীমতীর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে কৃষ্ণচিন্তাই তাঁহার একমাত্র সম্বল হইল।

পাঠক! ইহা অতিরঞ্জিত নহে। সত্য সত্যই প্রেমের রাজ্যে—বাস্তব জগতে এইরূপই হইয়া থাকে। যদি প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা থাকে, প্রেম-ভক্তি সাধনা কর। আর এক দিন আমরা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পুনরাভিনয় দেখিয়াছি,—প্রেম-ভক্তির সাধক চৈতন্যদেবও কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

আর আমাদের রাধা কখনও বা

"নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।

ও দু'টী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা

আবার কখন বা

"সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসয়ে পরে॥"

প্রেমাবতার কৃষ্ণচৈতন্যেরও

"কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥
যদি কেহ রাধে বলি উচ্চশব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে॥
প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥"

গোবিন্দদাসের করচা।

শ্রীরাধা "স্বীয় নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন—তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি আছে করযোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না—মেঘের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া পড়িতেছে—কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের ন্যায়। এক দৃষ্টে তিনি ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে—" *

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধ্যানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখায়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
কি করে দু হাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥"

রাইএর এরূপ অবস্থা দেখিয়া রাধাগতপ্রাণা সখীগণ বলিতেছেন:—

"কেহ কহে মাই ওঝা দে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।"

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ স্থির নহেন, তিনিও রাধার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতার বর্ণনা—

নায়কের পূর্ব্বরাগ

বলিয়া খ্যাত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষতলে বসিয়া প্রাণের সখা সুবলকে

বলিতেছেন যে, একদিন ধবলীর অন্বেষণে বৃকভানুপুরে গিয়া এক অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন। সে দৃশ্য এই ঃ—

"মগন করিয়া　　গেল সে চলিয়া
সোণার পুতলি কায়া।"

শুধুই কি এই? তাহার

"তাহে নীল সাড়ী　　ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপম ছায়া॥"

কি সুন্দর! একে সোণার বরণ তার উপর নীল সাড়ী। সে অপরূপ রূপ দেখিয়া আমাদের নায়ক বলিতেছেন ঃ—

"লখিতে নারিনু　　কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি॥"

চক্ষু ঝলসিয়া যায়, দেখিবে কেমন করিয়া?

"সই, সেরূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা　　বসন শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে　　মুকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সিঁথায় সিন্দুর　　নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে॥
নীল যে সাড়ি　　মোহন কারী
উছলিতে দেখি পাস।
কি আর পরাণে　　সঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥"

এইরূপ দেখিয়া, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং রতি পতি

"হেরিয়া মদন গেলা সে সদন
মুখ না তুলিল লাজে।"

আর আমাদের নাগরের

"হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহিল পশি।"

নন্দনন্দন তখন শ্রীরাধাকে পথে, যমুনার তটে ও আঙ্গিণার মাঝে অনেকবার দেখিয়াছেন; যত দেখেন ততই দেখিবার ইচ্ছা আরও বলবতী হয়।

ক্রমে ক্রমে

"পুন না হেরিয়ে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।"

প্রাণের সখা সুবল সব কথা শুনিলেন। তিনি বলিলেন "সখা, ভয় নাই। আমি ইন্দ্রজালবিদ্যা জানি। শীঘ্রই আমি তোমার সহিত তাহার মিলন করিয়া দিব। এইবার

আপ্ত দূতীর *

কার্য্য আরম্ভ হইল। সুবলের এই দৌত্য কার্য্যে অমিতার্থার লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই অধ্যায়ে চণ্ডীদাসের অদ্ভুত কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুবল প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ইন্দ্রজালবিদ্যা দেখাইবার জন্য,

---

* নবিস্রম্ভস্ত ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যযেষপি।
স্নিগ্ধাচবাগ্মিনীচসৌ দূতীস্যাৎ গোপসুভ্রুবাং॥

একে একে দশ অবতার, শিশুপাল, দন্তবক্র, হলধরাদির রূপ ধারণ করিলেন। তার পর সুবল শ্রীকৃষ্ণকে চম্পক বনে রাখিয়া মধু মঙ্গলাদি ৫ জন সখা সহ বৃকভানুপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় একে একে দশ অবতার, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও সূর্য্যবংশের রাজগণের মূর্ত্তি প্রদর্শন করা হইল। সম্মুখে বৃকভানুরাজ আর 'ঝরকা' উপরে সখী সহ রাধিকা ও অন্যান্য পুরমহিলারা বসিয়া সুবলের খেলা দেখিতে ছিলেন। সর্ব্বশেষে

"তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার
হইল সুবল সখা

তাহা দেখিয়া, এদিকে রাধা

"দেখিতে দেখিতে ভুলল নাগরী
মুদল নয়ান দুটী।

* * * *

এ বোল বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে॥"

মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। রাজা ও রাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে ওঝা আসিল। রাইঅঙ্গ কমলশয্যায় শায়িত হইল অঙ্গে চন্দনলেপন করা হইল, সখীরা চামরব্যজন করিতে লাগিলেন, অনেক তন্ত্রমন্ত্র পড়া হইল, কিন্তু কিছুতেই শ্রীমতীর চৈতন্য হইল না।

এদিকে সুবল পরিচারিকার মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া বলিলেন যে, তিনি রাধিকার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহার অনেক তন্ত্রমন্ত্র জানা আছে। তারপর সুবল রাধা সমীপে আগমন করিয়া অনেক তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। শেষে

"কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায় রাধার স্থানে।"

তাহাতে কি হইল?—রাধিকা

"আঁখি দুই মিলি করেছে কচালি
দুখ অতি দূরে গেল॥"

তারপর সুবল সখা আরও বলিলেন;—

"সে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥"

তাহার

"অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥"

তাহাকে

"যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলটী করয়ে পাণি॥"

তাহার বর্ত্তমান অবস্থা

"তুলা খানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥"

কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণচৈতন্যেরও একদিন এইরূপ হইয়াছিল;—

"সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হল॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড।

তারপর সুবল বৃকভানুরাজকে বলিলেন যে, শ্রীরাধিকাকে যমুনা স্নানে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে আর কোন ব্যাধি থাকিবে না এদিকে সুবল পূর্ব্ব হইতে পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন ঃ—

"এ পথে গমন না কর বিলম্ব
আগে দেখ নটরায়।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা

"হংসগমনী রাজার নন্দিনী
প্রবেশ করল তায়।"

প্রবেশ করিয়া

"দেখিয়া নাগরে নাগরীর মুখ
মুরছিত ভেল তথা॥"

তারপর

"কেবল দরশ হইল হরষ
নয়ানে নয়ানে খেলা।
বচনে মিলন হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা॥"

এইরূপে প্রথম পরিচয় হইল। ইহার পরে

স্বয়ং দৌত্য *

আরম্ভ হইল। এ অধ্যায়েও চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে বাদীয়ার, পশারীর, বাজীকরের, নাপিতিনীর,

* স্বয়মেবাভি যুক্তে যা স্বয়ং দূতী তু সা স্মৃতা।

মালিনীর, চিকিৎসকের, দেয়াশিনীর, বানিকিনীর ও গ্রহবিপ্রের বেশে রাধা সমীপে গমন করিতে দেখিতে পাই। ইহার পরে

সম্ভোগ মিলন। *

এখন রাধার শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে কৃষ্ণচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই। কৃষ্ণানন্দে মাতিয়া স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী শ্রীরাধিকা আপনাকে ভুলিয়া—বিশ্বসংসার ভুলিয়া কৃষ্ণসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন। শ্রীরাধার পঞ্চ ইন্দ্রিয় কৃষ্ণরূপে মুগ্ধ—নয়ন কৃষ্ণরূপ দেখিতে চায়, নাসিকা কৃষ্ণগন্ধ আঘ্রাণ করিতে চায়, হস্ত কৃষ্ণসেবা করিতে চায়, পদ কৃষ্ণ সন্নিধানে যাইতে চায়, কর্ণ কৃষ্ণকথা শুনিতে চায়, এখন রাধার

"অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়;
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি॥"

পাঠক! এইরূপ তন্ময়তা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিয়াছেন কি? —আর একবার দেখিয়াছেন, তাহাও এই বঙ্গভূমে। কবিকল্পনা নয়—বাস্তব জগতের কথা; চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমরসে প্লাবিত বঙ্গদেশে প্রেমের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

---

* যয়োর্মিলিতয়োর্ভোগঃ সম্ভোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।

"গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাস।
কোথা হরি আছেন শ্যামল পীতবাস॥
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে।
কি বলিব প্রভুর বচন নাহি স্ফুরে॥
সম্ভ্রমে বলিল গদাধর মহাশয়।
নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয়॥
হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥"

চৈতন্যভাগবত, মধ্যম খণ্ড।

রাধাকৃষ্ণের মিলন অপূর্ব্ব-মিলন, ইহা আর হইবার নহে। তাই—

"সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥"

আমাদের প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস এই মিলনের উপমা দিতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—ত্রিভুবনে এমন সম্ভব হয় না।

"জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।
কুসুমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল॥
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।

কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥"

ঘোরা মেঘাবৃতা দিগন্তপ্রসারিণী অমানিশাকে অধিকতর ভয়ঙ্করী করিতে হইলে যেমন বিদ্যুতের প্রয়োজন, সেইরূপ এই মিলনের পূর্ণতা দেখাইবার জন্য পাগলা চণ্ডী বিচ্ছেদের ছায়াপাত করিয়াছেন। বিচ্ছেদের ছায়াপাত না থাকিলে অপূর্ব্ব মিলন হইত না। তাই

"দুহু কোরে দুই কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় সে মরিয়া॥"

ইহাই প্রেমের চরম সীমা। হারাই, হারাই, সদাই হারাই ভাব না থাকিলে প্রেম এত মধুর হইত না। ইহার পরেই

রসোদ্গার। *

শ্রীরাধা সখীগণকে কৃষ্ণ রসের কথা বলিতেছেন—সখীরা শুনিতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণকথা বলিতে যাইয়া রাধা বিরহে কাতরা হইতেছেন—প্রিয়তমের অদর্শন আর সহ্য হয় না।

"কহে সুবদনী, শুন গো সজনি
দুঃখ কি বলিব আর।
কি করি এখন জুড়াই জীবন
বদন দেখিব তার॥"

আর সহ্য করিতে পারেন না—হৃদয়ের পরতে পরতে অঙ্কিত লাব-

---

* "পূর্ব্বরাগ হৈতে যত ক্রমে রস হয়।
তাহার উদ্গার কৈলে রসোদ্গার কয়॥
রাধা সব রসকথা কহেন সখীকে।
সখীও সকল কথা কহেন রাধাকে॥
রাধাও সখীকে সব কহেন মরম।
প্রবোধ বচনে সখী করে নিবারণ॥"

গ্যের রাশি কৃষ্ণচন্দ্রের হাসিমাখা মুখখানি মনে পড়িলে হৃদয় ফাটিয়া যায়।

"তাহার আরতি কিবা দিবা রাতি
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ ফাটে মোর বুক
গুমরে গুমরে মরি ॥"

রাধাগতপ্রাণা সখীরা প্রবোধ দিতেছেন। কিন্তু প্রবোধবাক্য হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। অবশেষে শ্রীমতী স্থির করিলেন—

"সহেনাক আর, করি অভিসার
আজি হই বলরাম।
যশোদা মন্দিরে যাইব সত্বরে
ভেটিব নাগর কান ॥"

বলরামের রূপে যশোদা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাশায় যাইবেন কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না। ইহার পরে আমরা শ্রীরাধার

অনুরাগ *

দেখিতে পাই। মিলনের পরে অনুরক্তিকে অনুরাগ বলে। অনুরাগ আবার আট ভাগে বিভক্ত যথা ঃ—(১) কৃষ্ণ (২) মুরলী (৩) আত্ম (৪) সখী (৫) দূতী (৬) ধাতা (৭) কন্দর্প ও (৮) গুরুজনে প্রীতি। রাগ হইতেই অনুরাগের জন্ম। যে স্নেহে স্পষ্টরূপে দুঃখও সুখ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাকে রাগ বলে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধলেশ

---

* সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং। প্রিয়ং।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥

মাত্রে প্রাণনাশ পর্য্যন্তও প্রীতি প্রদান করে। একবার অনুরাগে রঞ্জিত হইতে পারিলে হৃদয়নাথ নিত্য নব নব ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সম্ভোগ মিলনে যে অংশটী রাধাচরিত্রে অসম্পূর্ণ ছিল, প্রেমিক কবি এ অধ্যায়ে তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা রাধার পূর্ণপ্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। জানি না পৃথিবীর কোন দেশে কোন কবি প্রেমের এরূপ জ্বলন্ত ছবি অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা। প্রেমময়ী রাধা এখন কৃষ্ণময়ী। সত্য সত্যই প্রেমোন্মাদিনী রাধিকা উন্মত্ত হইয়াছেন। তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণকে কখন নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন, আবার কখন সহচরীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আত্ম প্রতি আর লক্ষ্য নাই, কিন্তু যদি কেহ শ্যামের নিন্দা করে তবে তাহা সহ্য হয় না।

"স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি॥
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি॥"

তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু

"শ্যাম নাগর, তোমায় পাড়ে গালি।
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ ভাল॥"

আবার তখনি সখীর প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন :—

"মুগ্রিত অবলা, হৃদয় অখলা,
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥"

পরক্ষণেই কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন :—

"তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥"

কখন বা কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

"ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগতে কলঙ্ক রহিল চির দিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগধি হইনু॥"

আবার তখনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—তুমি যদি আমার প্রতি নিদয় হও, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব।

"বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥"

পরক্ষণেই স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"সুধার সমুদ্র, সম্মুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে
পাইবে এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাম, আলাপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।

জাতি কুল শীল, মজিল সকল.

ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥"

কখন বা সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"সজনি লো সই।

ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশরী কথা কই।"

কৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণপ্রেমে উদাসীনা হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন :—

"ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥"

আবার শ্যামচাঁদকে ভুলিবার জন্য শ্রীমতী

"কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি ॥"

অন্যত্র

"কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটী হাত দিয়া থাকি কাণে ॥"

শ্রীরাধা এত করিয়াও প্রিয়তমকে ভুলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার দশ ইন্দ্রিয় যে মুগ্ধ ; তাই

"যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পানে চায়॥
এছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
যে কথা না শুনিবে করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদায় সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥"

পাঠক! রাধার আর উন্মাদ হইবার বাকী রহিল কি? প্রেমের রাজ্যে—অপ্রাকৃত-ভাবাপন্ন পাগলের রাজ্যে এইরূপই হইয়া থাকে। চৈতন্যদেবও—

"ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
কে করিল আমারে বাউরি॥
আজানু-লম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥"

নরহরি দাস।

কখন

"আরে মোর গৌর কিশোর
নাহি জানে দিবানিশি,

কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥
ক্ষণে উচ্চস্বরে গায়,
ক্ষণে পহুঁ কি সুধায়,
কোথায় আমার প্রাণনাথ।"

আবার

"ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥"

এত ভালবাসা! এত আত্মদান! আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয় ধারণ করিতে পারে না—তাই আমরা রাধা-চরিত্র বিকৃত ভাবে গ্রহণ করি এ যে পাপময় পৃথিবীর নয়—স্বর্গীয়—শুধু পবিত্রতা, শুধু মধু, শু আনন্দের ধারা। ইহার পরের অধ্যায়

প্রেম বৈচিত্র্য। *

এই অধ্যায়ে কবি প্রেমকে স্নান, কমল, সুবর্ণ, চন্দন, ব্যাধি ভোজন, শেল, গরল ও পুষ্পমালার সহিত তুলনা করিয়াছেন প্রেমময়ের নিকটে শ্রীমতী বসিয়া আছেন, কিন্তু প্রাণনাথকে দেখিতে পাইতেছেন না—প্রেমে এতই বিহ্বলা, কাছে থাকিয়াও যেন দূর-অতি দূর মনে হইতেছে—যেন "কোলে অন্ধকার" দেখিতেছেন, সা শঙ্কা-বিজড়িত বিরহে চারিদিকে তাকাইতেছেন;—ইহার প্রতি ছ কাতরোক্তি ও দুঃখের নিবেদনে পরিপূর্ণ। এত দিনে শ্রীরা

* প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষঃ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তি স্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মুচ্যতে॥

বুঝিয়াছেন, প্রেম করিয়া কত দুঃখী হইতে হয়—ঘাটে আসিয়া যেন নৌকা ডুবিয়া যায়, অন্ধের একমাত্র 'নাড়' যেন হারাইয়া যায়। কিন্তু প্রেমের এই দুঃখের মধ্যে—নিরাশার মধ্যে দুঃখ সহ্য করিবার জন্য, দুঃখের ঔষধ সুখ আছে। যেন—

"নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ।"

তাহা না হইলে জীবন থাকিত না। ঐ একটু সুধাই দুঃখ বহন করিবার ক্ষমতা দেয়। তাই—

"কিছু কিছু সুধা, বিষ গুণ আধা,
চিরজীবী দেহ কৈল।"

ইহার পরে—

অভিসার।

আর শ্রীমতী থাকিতে পারিতেছেন না। হৃদয়-বল্লভের জন্য,—কেবল একবার মিলিত হইবার জন্য কুঞ্জে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এক দিন শ্রীকৃষ্ণ—

"শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করিল তাতে॥"

এদিকে শ্রীমতী বঁধুর সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া—

"নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহ মাঝে॥"

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নীতামসীযান যোগ্যবেশাভিসারিকা॥

কিন্তু শ্রীমতীর আর অভিসার করা হইলা না ; কারণ-

" * * * যেতে অবসর নাই

অকুরাণ হ'ল গৃহ কাজে।"

গৃহকর্ম্ম ত আছেই, তাহা ছাড়া—

"শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে।"

তাহাও নানা ছলে সুসম্পন্ন করিয়া বাহির হইয়া দেখি—

"আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র।"

কাজেই শ্রীমতীর অভিসার আর করা হইল না। এইবার আমরা শ্রীমতীকে হৃদয়নাথের আশায় বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। এই অধ্যায়ের নাম

বাসক সজ্জা। *

ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল এবং সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া রাধাকুঞ্জে পতিত হইল। শ্রীরাধা তাম্বুল, পুষ্পের মালা, স্নিগ্ধ বারি ইত্যাদি যথা স্থানে রাখিয়া প্রিয়তমের আশাপথ চাহিয়া বাঞ্ছিতের সুধামাখা বাণী শুনিবার জন্য, প্রেমাস্পদের চন্দ্রমুখের মধুর হাসি দেখিবার জন্য, শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আজ সাজসজ্জা কিছু বেশী। "মল্লিকা, মালতী আর যাতি যূথী" ফুলে শয্যা রচনা করিয়াছেন ; তাহার উপর ফুলের উপাধান ; কেবল ইহাই নয়—গৃহ, প্রাঙ্গণ, প্রাচীর ইত্যাদি ফুল্লকুসুমদলে আবৃত করা হইয়াছে।

---

* "যা বাসগেহ পরিকল্পিত তল্প মধ্যে,
তাম্বুল পুষ্পরচনেশ্চ সমস্ত সজ্জা।
কান্তস্ত সঙ্গমসুখং সমবেক্ষ মাণা,
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাস সজ্জা॥"

"ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস, আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুলেশ্বর॥"

আর সেই কুসুমরাজির অভ্যন্তরে কুসুমলক্ষ্মীরূপিণী, কুসুমবসনা, কুসুমভূষণা, প্রস্ফুটিতা-কমলিনী-সদৃশা শ্রীরাধিকা বুকভরা মধু লইয়া প্রিয়তমের অভ্যর্থনার জন্য হৃদি-সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছেন। আমরা রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেও এইরূপ আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতে দেখিতে পাই।

"অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমি গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে॥
কানন পল্লব বিছাইয়া।
রহে পঁহু ধেয়ান করিয়া॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসক-সজ্জার ভাব করে॥"

ইহার পরবর্ত্তী অবস্থার নাম

বিপ্রলব্ধা *।

---

* কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত বল্লভে।
ব্যথমানান্তরাপ্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥
নির্ব্বেদচিন্তা খেদাশ্রু মূর্চ্ছা নিশ্বসিতাদিভাক্॥

শ্রীমতী এইরূপে আশাপথ চাহিয়া আছেন। আজ আর তাঁহার নয়নে নিদ্রা নাই—যাহার হৃদয়ে বিরহানল জ্বলিতেছে, সে কেমন করিয়া নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইবে? অবশেষে প্রিয়তমের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীমতী রাধা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—দূতী পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীরাধা ভাবিতেছেন—"সই! পাছে এ সব হবে আন।" তিনি

"দুকাণ পাতিয়া ছিল এতক্ষণ,
বঁধুপথ পানে চাই।"

অবশেষে

"পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকে উঠিল রাই॥"

নিশি প্রায় অবসান। বাঞ্ছিতের দেখা নাই—রাধা যে সুরধুনী-তীর হইতে শুষ্ককণ্ঠে ফিরিতেছেন। এ যে অসহ্য, তাই সখীকে বলিতেছেন:—

"কি বুদ্ধি করিব পাষাণে ধরিয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা।"

অবশেষে সত্য সত্যই শ্রীরাধা আশায় নিরাশ হইলেন—তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল—দুষ্ট অলির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুটিতা কমলিনী সদৃশা রাধার কথা ভুলিয়া অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিতা যুথিকা-তুল্যা চন্দ্রাবলীর সহিত নিশি পোহাইয়া প্রভাতে রাধাকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। এইবার

খণ্ডিতা *

---

* উল্লঙ্ঘ্যাসময়ং যস্যাঃ প্রয়াণস্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা॥

আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের চাঁচর কেশগুলি স্থানচ্যুত, হৃদয়ে যাবক চিহ্ন, শরীরে কঙ্কণের দাগ। হৃদয়ে তীব্র প্রেমানল জ্বালিয়া, সমস্ত রজনী আশার বাতাসে উত্তেজিত করিয়া, প্রভাতে প্রত্যাখ্যান বারি পাইলে কে স্থির থাকিতে পারে? চন্দ্রোদয়-দর্শনে চঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় কৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরাধার ধৈর্য্য লোপ হইল। তিনি বলিলেন :—

"আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমনে গোঁয়ারী॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীত।
কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলে মুখ খানি মুছাই॥"

রাধিকার ব্যঙ্গোক্তি তীব্র বটে, কিন্তু সোহাগ-শূন্য নহে। এ ক্রোধে কঠিনতা নাই—কোমল পুষ্পরেণু দ্বারা গঠিত ও মধুমাখা।

শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইলেন। বিহিত বা অবিহিত উপায়ে আত্ম-সমর্থন করা জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণও নিজের দোষ স্বীকার করিতে পারিলেন না—হৃদয়কে বঞ্চনা করিয়া আত্ম-সমর্থন করিলেন :-

"সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুঃখ॥

*   *   *   *   *

ফাগু-বিন্দু দেখি সিন্দুর-বিন্দু কহ
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ ॥"

এ কৈফিয়তে রাধার মন মানিল না। তাঁহার প্রতি পলে পলে চিন্তা, পাছে প্রিয়তমকে হারাইয়া ফেলি,—পাছে চন্দ্রাবলী তাঁহার হৃদয়েশ্বরকে অধিকার করিয়া লয়। তাই তিনি প্রেমাস্পদকে অধিকতর দৃঢ় প্রেমবন্ধনে বাঁধিবার জন্য অভিমান করিলেন। ইহাই শ্রীমতীর মান *!

কিন্তু মান করিবে কে? দশ ইন্দ্রিয় যে কৃষ্ণময়—রাধার স্বাধীনতা;—স্বতন্ত্রতা যে নাই। তাই চণ্ডীর মান কেবল অশ্রুর ইতিহাস—কেবল বিনয়, কেবল অনুনয়; ইহাতে দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, রূপগুণের গর্ব্ব নাই; ভালবাসার স্রোতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র অহঙ্কার, ক্ষুদ্র প্রাণ—সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। যে অশুভক্ষণে রাধিকা মান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সখীকে বলিলেন ঃ—

"আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর-শেখর
কাঁহা সখি করল পয়াণ ॥"

শ্রীরাধার সকলি ছিল। বিধিবশে নয়,—তাঁহার নিজ কর্ম্মদোষে

* দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥
—উজ্জ্বল নীলমণি।

তিনি হারাইয়াছেন। তাই তিনি সখীর নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

"আরে সই কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সে হেন পিয়া
অতি ছার মানের দায় ॥"

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণও স্থির নহেন। রাধাবিরহে তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা

"কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহন বনে ॥
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাও ত গড়ি ॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব।
রাই সুধামুখী কেমনে পাব ॥"

উভয়ের অবস্থা তুল্য রূপ। সখীগণের চেষ্টায় পুনরায় মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণ গলে পীতবাস লইয়া বলিলেন ঃ—

"এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনী, জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী ॥"

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া

"এত শুনি গোরী, দু'বাহু পসারি
বঁধুয়া করিল কোলে।"

ইহার পর

কলহান্তরিতা *।

পরমেশ্বর বুঝি অভাগিনী রাধার কপালে সুখ লেখেন নাই, তাই আবার বিরহের সূচনা হইল। অসাড় প্রাণকে সচেতন করিতে হইলে যেমন তীব্র ঔষধের প্রয়োজন, সেইরূপ মিলনকে সুখকর করিবার নিমিত্ত বিচ্ছেদের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ

গোষ্ঠে †

(নিকট প্রবাস)

গেলেন। সখাগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ

"হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে॥"

তখন আকুল পরাণে, কাতর নয়নে

"গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে॥"

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অন্তরে ব্যথা পাইলেন। একে নবনী সদৃশ কোমল অঙ্গ, তায় সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, এই অসময়ে তিনি ভীষণ-

---

* যা সখীনাং পুরঃ পাদ পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥

† শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদেগাপঃ পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ॥
তত্র কুর্য্যাদ্গবাং পূজাং গোগ্রাসং গোঃ প্রদক্ষিণাম্।
গবানুগমনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বান কামানভীপ্সতা॥

সর্পসঙ্কুল ও কুশাঙ্কুরপরিপূর্ণ বনে গমন করিতেছেন। শ্রীপদে কতই না ব্যথা পাইবেন। কৃষ্ণময়ী রাধা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি যশোদা-মার প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"কি আর বলিব মায়।
কিছু দয়া নাই, তাঁহার হৃদয়ে
এ কথা বলিব কায়॥"

শ্রীমতীর ভয় হইল—কারণ শ্রীঅঙ্গ

"শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল
পাছে বা গলিয়া পড়ে।"

তার পর চারি চক্ষে মিলন হইল। তখন

"সঙ্কেত ইঙ্গিত কহিয়া চলিল
রসিক নাগর কান।
মথুরার পথে বিকি অনুসারে
সাধিতে চলিল দান॥"

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতে শ্রীরাধাকে জানাইলেন যে মথুরার পথে তিনি দান (রাজ-কর) সাধিতে চলিলেন এবং নানা ছলে ব্রজ বালকদিগকে বনে পাঠাইয়া নিজে মথুরার পথে উপস্থিত হইলেন। তথায় কদম্বশ্রেণীর মধ্যে কদম্বতলায় নটবর-বেশে নাগররাজ দান সাধিবার ছলে বসিলেন। এ দিকে রসময়ী রাধা—

"বড়াইয়ে ডাকি কহে চন্দ্রমুখী
যাইব মথুরা পানে।
আনি গোপীগণ যুথের মিলন
চল চল যাব বিকে।

দধির পশরা সাজাহ তোমারা
বিলম্ব না কর মোকে ॥”

শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য মথুরার পথে চলিলেন। পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাধা দিয়া বলিলেন,—

“কানু কহে শুন গোপী আমার বচন।
দান দিয়া মথুরাতে করহ গমন ॥
কড়ি নিব আজি বুঝি কড়ি কড়া।
রাজার হাসিল কড়ি নাহি যায় ছাড়া ॥”

শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কত দান চাই? উত্তরে দানী (শ্রীকৃষ্ণ) বলিলেন:—

“অমূল্য রতন নিবতো এখন
বেণীর যে হয় দান।
এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে না হয় আন ॥
সিঁথার সিন্দুরে দুই লাখ নিব
নাশার বেশরে রাই।
তিন লাখ নিব মুকুতার দান
বেশের উপমা নাই ॥
হাসির সোসর পাঁচ লাখ পর
নিব সে এখনি গণি।

* * * * *

কাঁচুলির কড়ি দশ লাখ নিব
হারের বিংশতি লক্ষ।

*　　*　　*　　*　　*

নিতম্ব মণ্ডল　　সাত লাখ নিব
নূপুর সহস্র পর।

*　　*　　*　　*　　*

নীলবাস পর　　শোভিত সুন্দর
ইহা বা কিসের লেখা।
দশ লাখ নিব　　কে তোমা রাখিবে
পেয়েছি তোমার দেখা॥
কিঙ্কিনী নূপুর　　কোটি লাখ নিব
যাহার উপমা নাই।"

তারপর কত কথা, কত রহস্য, কত প্রেমকলহ হইল। শেষে মিলন হইল। চণ্ডীদাসের এই অংশটী বড়ই মধুর। তারপর শ্রীরাধা ব্রজগোপীগণ সহ মথুরায় দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে গমন করিলেন। ফিরিবার সময়

"দেখিয়া যমুনা　　নদীর তরঙ্গ
উঠেছে দারুণ ফেনা।
দেখিয়া নাগরী　　সকল গোয়ালী
লাগিল বিস্ময় পণা॥"

তখন

"বড়াই কহিছে　　রহি রাধা পাশে
শুনগো আমার বাণী।
কুসুর চরণে　　বিনতি করহ
পার করে গুণমণি॥"

তারপর শ্রীকৃষ্ণ নৌকা লইয়া পার করিতে আসিলেন। একে একে

সকলকে নৌকায় তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। নৌকা যমুনার মধ্যে স্রোতে পড়িয়া অন্য দিকে চলিল। ব্রজ-গোপীরা ভয়ে অস্থির হইলেন। তাঁহারা ব্রজরাজকে বলিলেন :—

"এ তিল তুলসী তোমার চরণে
সঁপিয়াছি জাতি কুল।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
তুমি সবাকার মূল॥
তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
আর বা বলিব কেহ।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
দিয়াছি আপন দেহ॥"

তারপর শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ ব্রজগোপীদিগকে কুলে তুলিয়া দিয়া গাভী সহ গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ব্রজবালকেরা নন্দনন্দনের অনুপস্থিতিতে "কাঁদিয়া আকুল সবে বেয়াকুল' হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজ দোষ স্খলনের জন্য বলিলেন:—

"চোরা ধেনু হেদে বনেতে হইতে
গেছিল মথুরা মুখ॥
তাঁহা ফিরাইতে তেঁই সে বিলম্ব
শুন বলরাম দাদা॥"

এদিকে রাখাল-বালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠিল এবং তাহারা তাহাদের প্রাণের কানাইএর নিকট অন্ন-ভোজনের বাসনা জানাইল। কৃষ্ণ-বলরাম যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণের পত্নীদিগের নিকট অন্ন-ভিক্ষা করিয়া আনিয়া রাখাল বালকগণকে দিলেন। রাখাল-বালকগণ তৃপ্তির সহিত

ভোজন করিল। তার পর গৃহে ফিরিবার সময় "শাঙলী ধবলী" পাওয়া গেল না। এই গাভী দুইটী নন্দরাজের অতিপ্রিয়। কানাই রাখাল-বালকগণের সহিত সমস্ত বন খুঁজিলেন—কোথাও পাইলেন না। তখন ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে ব্রহ্মা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ধেনু হরণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া

"সেই ব্রজবালা　　তখনি সৃজিলা
শাঙলী ধবলী গাই॥"

ইহা দেখিয়া ব্রহ্মার সংশয় দূর হইল। তিনি তখন ধেনু বৎস লইয়া কানুর নিকটে গমন করিলেন ও যোড়করে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন:—

"তুমি দেব হরি　　দেবের দেবতা
তুমি হিতকারী হও।
তুমি চন্দ্র দিবা　　তুমি মহাতেজা
তুমি ত তারণ হও॥"

তার পর সকলে ব্রজে ফিরিলেন। যশোদা কানুকে ক্ষীর-নবনী ভোজন করাইয়া বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন করাইলেন। মাতার ক্রোড়ে মাতা ও পুত্রে অনেক কথা হইল—যশোদা গোষ্ঠের কথা, ধেনুর কথা, বনের কথা, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ

"এই মত নীতি　　বনে বিহরয়
অপার যাহার লীলা।"

একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, শ্রীমতী রাধা তাহা দেখিয়া সখীকে বলিতেছেন:—

"বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেঁধে যাব চল যথা কমল আঁখি ॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে ॥"

পরক্ষণেই

"পর পীতধড়া মাথে বান্ধ চূড়া
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল কর উচ্চ রোল
যাইব যমুনা তীরে ॥"

সত্য সত্যই এইবার

রাধাগোষ্ঠ।

আরম্ভ হইল। রাধার যে কুঞ্জ, কোমলাঙ্গ গোপবালাগণের হাস্য কৌতুকে পরিপূর্ণ থাকিত, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা গোষ্ঠ কোলাহলে পূর্ণ হইল। রাধার সখীগণ গোষ্ঠ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। মস্তকে চূড়া, অঙ্গে ধড়া, করে 'পাচনী' লইয়া 'হারে রে রে' শব্দে কুঞ্জ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। গোষ্ঠে যাইবার জন্য

"সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি ॥'

কিন্তু এক বিপদ, বক্ষঃ ঢাকা গেল না, তাই ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য

"কমলের ফুল গাঁথি শতদল,
সবাই গাঁথিল মালা।"

সকলেই মালা গলে লইলেন।

তাহাতে-

"ফুলের চাপনে কুচ ঢাকা গেল
চলিলা পরম সুখে ॥"

এইরূপ ছদ্মবেশে সখীগণ সহ শ্রীরাধিকা শৈবালময় যমুনার শ্যাম উপকূলে 'সাঙলী, ধবলী, বলী' লইয়া নানারঙ্গে চলিতে চলিতে শ্যাম কুঞ্জের দ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও চিনিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কোন্ গ্রামে বসতিরে কোন গ্রামে ঘর।
আমার সঙ্গেতে কেন হরিষ অন্তর ॥"

এই দৃশ্য দেখিবার জন্য

"ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে ॥
বৃষ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখবাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি ॥"

এইরূপে প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে নানা লীলা করেন। একদিন প্রভাতে সুবাসিত জলে গোকুলচন্দ্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া মা যশোমতী বলিলেন ঃ—

"আজ্ বনে তুমি যাবে যাদুমণি
শুনিতে লাগয়ে ডর।
লোক মুখে শুনি বিষম কাহিনী
থাকয়ে কংসের চর ॥"

আজ শেষ গোষ্ঠ। মায়ের প্রাণ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছে, তাই কানাইকে আজ গোষ্ঠে যাইতে দিতে প্রাণ চাহিতেছে না। যাহা

হউক শ্রীকৃষ্ণ নানা মধুর বচনে যশোদাকে আশ্বস্ত করিয়া "হৈ হৈ বলি দিয়ে করতালি" ধেনুর পাল লইয়া গোষ্টে গমন করিলেন। এ দিকে কংস নরপতি অক্রূরকে ডাকিয়া বলিলেন :—

"ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করি আরম্ভণ
তুমি সে গোকুলে গিয়া।
কৃষ্ণ বলরামে আনহ স্বজনে
ত্বরায় আসিবে লয়া॥"

মহানন্দে অক্রূর গোকুল যাত্রা করিলেন। অক্রূরের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা আজ অক্রূরের

"শুভ দশা মোর আজি সে ফলিল
দেখিব গোলক পতি॥
যে পদপল্লব যোগীর ধেয়ান
করিলে নাহিক পায়।
সে জন দেখিব নয়ন ভরিয়া
দু'আঁখি জুড়াব তায়॥"

পূর্ব্বে আমরা যে রাধার বিরহের কথা বলিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে এইবার আরম্ভ হইতে চলিল। যেমন পৌর্ণমাসীর সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে অমানিশার ভীষণত্ব উপলব্ধি করিতে হয়, যেমন সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ-ছায়ার শান্তি উপভোগ করিতে হইলে মধ্যাহ্ন গগনের উজ্জ্বলতা দেখিতে হয়, সেইরূপ সম্ভোগের মাধুর্য্য বুঝিতে হইলে বিরহের অশ্রুধারা দর্শন করা আবশ্যক। তাই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন এই দীর্ঘ বিরহের প্রথম অংশ

প্রবাস ।*

(দূর-প্রবাস)

ও শেষ অংশকে মাথুর কহে ।

এদিকে কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধাও স্বপ্নে দেখিলেন

"নিশি অবশেষে ঘুমে অচেতন
হেনক সময় কালে ।
রথ আরোহণ করি একজন
আইল গোকুল পুরে ॥"

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার কি নাম ? তুমি কোথায় যাইবে ? উত্তরে সে

"কহিতে লাগিল সব বিবরণ
অক্রূর আমার নাম ।
কৃষ্ণ বলরামে আনিতে যতনে
এ কংস রাজার ধাম ॥"

ব্রজগোপীরা এই স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন । একজন গৌরি-শিরে পুষ্প দিয়া ভবিষ্যত জানিবার জন্য গমন করিলেন, অন্যজন গ্রহবিপ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন , কিন্তু সকল স্থানেই ভবিষ্যত অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন । এদিকে অক্রূর নন্দ ভবনে উপস্থিত হইলেন । নন্দ মহাসমারোহে বিশিষ্ট অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে

---

* পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্য়ূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥

"অক্রুর চরণে পড়িয়ে করয়ে
স্তবন স্মরণ ধ্যান।
পরশ করিতে তাহার হৃদয়ে
লইল ব্রহ্মহি জ্ঞান॥"

নানা প্রকার স্তব স্তুতির পর অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন বার্ত্তা প্রচার করিলেন। যত গোপগণ শকট পূর্ণ দধি, দুগ্ধ লইয়া নন্দদ্বারে উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মজগতে বিরহের ন্যায় শিক্ষক আর নাই। প্রেমের রাজ্যে—নয়ন জলের রাজ্যে বিরহ প্রবেশ করিলে আমিত্ব থাকে না, দ্বৈত থাকে না, ভেদ থাকে না—ভক্তহৃদয় পবিত্র হয়। বিরহে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না—প্রাণনাথের সহিত মিশিয়া যায়—প্রিয়তম সদাই প্রেমিকার হৃদয় জুড়িয়া বিরাজ করে—শয়নে, স্বপনে, অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, অন্তরালে প্রাণের প্রাণ একবারও চক্ষুর অন্তরালে যাইতে পারে না। প্রেমের মিলন প্রাণে প্রাণে—তাই হৃদয়ে প্রেমময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন বিষয়ক

"ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দিরে গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায়
শ্যাম চাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥

তোমরা যে বল শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বন্ধু পালাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥"

ফলে কিন্তু তাহা হইল না—সত্য সত্যই শ্যাম মধুপুরে গেলেন। শ্রীরাধা নির্জ্জনে যমুনা-পুলিনে বসিয়া যত ভবিষ্যত সুখছবি আঁকিয়াছিলেন, আজ নিয়তি সব মুছিয়া দিল। শ্রীরাধারপ্রাণ শূন্য বৃন্দাবনের শূন্য পঞ্জর-পিঞ্জরে পড়িয়া রহিল। সমস্ত বৃন্দাবনে শোকের ছায়া পতিত হইল—যশোদা, ব্রজগোপীগণ ও রাখাল বালকগণের বিলাপে ব্রজভূম পূর্ণ হইল। এরূপ শোকের চিত্র অন্য সাহিত্যে বোধ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনকালে

"কোলে লয়ে যদুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেমবারি।
ধরিয়া গোপাল করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি ॥"

ব্রজগোপীগণ

"শ্রীমুখ-পঙ্কজ চাহি গোপীগণ
নয়নে বহয়ে লোর।
যেন সুরধুনী— তরঙ্গ তেমনি
ভিজিল বসন জোর ॥"

আর শ্রীরাধার

"গাগরি গাগরি যেন বারি ঢারি
লোচন-কমল তায়।

চিত্রের পুথলি সে নব কিশোরী
কাষ্ঠের পুথলি প্রায় ॥”

ব্রজ বালকগণ বলিতেছেন :—

“স্বপন নয়নে ভোজন গমনে
সদাই তোমারে দেখি।
কেমনে তোমার লেহ পাসরিব
শুন হে কমল-আঁখি ॥”

শ্রীরাধা বলিতেছেন :—

“ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে রও।
চাঁদ-মুখ খানি আগে নিরখিয়ে
তবে সে মথুরা যেও ॥”

শ্রীকৃষ্ণ সকলকে „প্রবোধ দিয়া, সান্ত্বনা করিয়া, মিষ্ট কথায তুষ্ট করিয়া মধুপুরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রজকের বস্ত্র হরণ, কুব্জার নিকট গন্ধ মাল্য গ্রহণ করিলেন। মথুরায় উপস্থিত হইয়া দৈবকী ও বসুদেবের উদ্ধার করিলেন। তারপর নন্দ বৃন্দাবনচন্দ্রকে মথুরায় রাখিয়া শূন্য রথ লইয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণকে না দেখিয়া যশোদা বলিলেন :—

“শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
জ্বালহ আনল ভালি।
তাহে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহ ত আনল জ্বালি ॥”

এদিকে কৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতী

“সোণার পুথলি অবনী উপরে
যেন ক্ষন গড়ি যায়।

নিশ্বাস হুতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে দুলিছে বায়॥
তা দেখি গোপিনী মনে অনুমানি
রাধা যেনে আছে জিয়া।
হেন মনে ছিল রাধা কি বাঁচিবে
এ হেন বিরহ পেয়া॥"

ব্রজভূমে তখন,

"খগ মৃগগণ রোদন বেদন
আহার নাহিক খায়।
ডালে বসি খগ শ্যাম শ্যাম করি
রাতি দিন নাম লয়॥
মৃগগণ অতি চেয়ে আছে কতি
নয়নে বহয়ে লোর।

* * *

সেই পিকু রবে এ পঞ্চ শবদে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ নাহিক আপদ
সে ডাল চলল ছাড়ি॥
ভ্রমর ভ্রমরী সদাই গুঞ্জরি
সে নাহি শবদ করে।
চকোর ডাহুকী চাতক চাতকী
তাহা না শবদ বলে॥

হংস হংসিনী শুক শারী গণি
তাহা না শবদ একে।
নিশবদ হই নিরন্তর রোই
না জানি কোথায় থাকে ॥"

শ্রীরাধা প্রিয়তমের আশাপথ চাহিয়া আছেন—কত কল্য অতীতের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। অবশেষে

"উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু'আঁখি হইল অন্ধ।"

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গত হইল কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্র বৃন্দাবনে আসিলেন না। পূর্ণ এক বৎসর গত হইল—আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল। এইরূপে একে একে শত বৎসর অতীতে মিশাইল, শ্রীরাধা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এক সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"যাও সহচরী মথুরা মণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা ॥"

এইবার

মাথুর

আরম্ভ হইল। রাধার দূতী মথুরায় কৃষ্ণ অন্বেষণে গেলেন। বৃন্দাবন-চন্দ্রের অভাবে আজ বৃন্দাবণ শূন্য। এই শূন্য বৃন্দাবনে শ্মশান ভূমে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠের মত শ্রীহীন রাধিকা বর্ত্তমান। রাধিকা আজ উন্মাদিনী। আজ আর জ্যোৎস্নাধৌত শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য, কুসুম

ভূষণা ধরণীর হাস্ত, বনবৈতালিক পিকবরের মধুর সঙ্গীত, বন নর্ত্তক ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য, বৃন্দাবনের সেই ধীর সমীর, সেই যমুনা পুলিন, সেই নিকুঞ্জ কানন কিছুতেই—কোন প্রলোভনেই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না। হারানিধি পুনরায় হারাইলে কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? একবার চৈতন্ত দেব

"প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হাহা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥"

আর আমাদের রাধার মুখে বাক্য নাই, অধরে হাস্য নাই, মনে সুখ নাই, হৃদয়ে সে ভাব নাই, বুঝি প্রাণও আর থাকে না। সখীরা

"কালিন্দী পুলিনে কমলের শেজে
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম
নিশ্বাস পরখে কেহ॥
কেহ কহে ভোর, বঁধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে।

*   *   *

দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে
রাই দেহ হরি বলি॥"

কৃষ্ণ ভক্তের চেতনহীন দেহে চৈতন্ত সঞ্চার করিতে হইলে হরি নাম করিতে হয়—ইহাই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। সখীগণ রাধাকে এই মহৌষধি দিতেছিলেন। চৈতন্ত দেবও যখন এইরূপ অজ্ঞান হইতেন, সে সময়ে এই অমৃত সদৃশ মহৌষধি কার্য্যকরী হইত।

"যখন বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত॥"

চৈতন্যভাগবত—মধ্যম খণ্ড।

যথা সময়ে দূতী মথুরায় উপনীত হইলেন। মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

"ওহে ও কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাইমুখ-ইন্দু॥
ওহে ও পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাইল মোরে।
দাসখত দেখাইবার তরে॥"

"শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে।
হৃদয় পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেম সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥

এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাছিয়ে আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।"
"ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
জনম অবধি কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে হে॥
ব্রজগোপী হতে মথুরা নাগরী
কত রূপে গুণে বটে হে॥
কিংবা কুবুজা নামে কুবুজিনী
তেঞি লেগেছে মনে।
আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারী
বিধি মিলাইছে জেনে॥

* * * *

যতেক তোমারে পীরিতি করুক
তেমন পীরিতি হবে না।
রাধানাথ বিনে কুবুজার নাথ
কেহ ত তোমারে কবে না॥"

এই সব পদে একটু ব্যঙ্গের ছায়া আছে—কিন্তু তাহাতে—পদ গুলি আরও মিষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ সখীমুখে রাধার অবস্থা অবগত হইয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে রাধার নিরাশার তমসায় ঘেরা হৃদয়ে বর্ষার জলদকোলে সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষীণ আশা ফুটিয়া উঠিল; তাঁহার মনে হইল আবার বুঝি তমালে মাধবীলতা সোহাগ ভরে খেলিবে, শ্রীরাধার হৃদয়মণি আবার হৃদয়াকাশে শোভা পাইবে—আবার হাসির লহরী ফুটিবে। তিনি সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"সই, জানি কু-দিন সুদিন ভেল।"

কেন সু-দিন হইল? কারণ

"মাধব মন্দিরে তুরিত আওব
কপাল কহিয়া গেল॥"

'কপাল' বলিল মাধব আসিবে। অদৃষ্টের কথা বিশ্বাস হইল না? সখি! তবে শুন আরও প্রমাণ আছে।

"চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥"

আজ শ্রীমতীর নিকট যৌবন ভার বলিয়া বোধ হইতেছে না। বসন ও কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে, বামঅঙ্গ ও চক্ষু স্পন্দন করিতেছে। সখি! এ সব সুলক্ষণ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতেছ না? আরও উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আছে।

"প্রভাত সময়ে কাক কোলাহলি
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥"

অন্য দিন প্রিয়তমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পলায়ন করিত, আজ পালাইতেছে না—কি জন্য?—কৃষ্ণ দরশন করিবার জন্য। সখি! আমার আরও প্রমাণ আছে ঃ—

"মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।"

আজ আনন্দভরে মুখের তাম্বুল ও দেবতার মাথার ফুল পড়িতেছে *। সখী মাধব যে আসিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

সত্য সত্যই প্রেমময়ী রাধার ভবিষ্যত বাণী সফল হইল—সত্য সত্যই 'কুদিন সুদিন ভেল'—সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ শত বর্ষ পরে ব্রজে আসিলেন। আজ রাধার মলিন মুখশ্রী উজ্জ্বল হইল—আজ 'ত্বং'রূপী রাধার সহিত 'তৎ' রূপী কৃষ্ণের মিলন হইল। এই মিলনই

---

* এখনও বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় এই রীতি প্রচলিত আছে। কোন ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিতে হইলে দেব মন্দিরে গমন করিয়া পুরোহিতের দ্বারা দেবতার মস্তকে পুষ্প দিতে হয়। যদি ফুল পড়িয়া যায় তবে শুভ জানিতে হইবে।

ভাব সম্মিলন *।

আজ আর রাধাকুঞ্জে আনন্দের সীমা নাই। বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল্ল কুসুমরাজি মলয়সমীরণসহ হাসিতেছে, খেলিতেছে ও নাচিতেছে —ব্রজবালাগণ ফুল্ল প্রাণে কুসুম চয়ন করিতেছেন। আজ চারিদিকে হাসির লহরী ছুটিতেছে—উপরে নীল নভোমণ্ডলে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, শশাঙ্কের হাসি দেখিয়া নীচে প্রকৃতি দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনিও, আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোরা হইয়া, হাসিলেন। সুধাংশুর সহিত প্রকৃতি দেবীর এই গুপ্ত হাসি খেলা দেখিয়া যমুনার কালজলে অসংখ্য ক্ষুদ্র বীচিমালা পরস্পর পরস্পরের গায়ে হাসিয়া গলিয়া পড়িল। এই হাসি রাশির মধ্যে রতন পালঙ্কে রাধাকৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন—সখীগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। আজ

"শতেক বরষ পরে, বধুয়া মিলিল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥"

আজ আর রাধার অবকাশ নাই। গত শত বর্ষের কথা বলিতে ও আর যাহাতে বিরহানলে পুড়িতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে রাধা ব্যস্ত।

প্রেমিকার হৃদয় বসন্ত সখা কোকিলের কুহু তানে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে, মলয়-পবনে, চন্দ্রের আলোকে, প্রিয়তমের সত্ত্বা উপলব্ধি করে। তাই

---

* শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্য ভাক্।
রুচিভিশ্চিত্ত মাসৃণ্য হৃদসৌভাব উচ্যতে॥

পূর্ব্বে এই সব উন্মাদিনী রাধাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিত। কিন্তু আজ আর সে ভয় নাই; শ্রীমতী প্রিয়তমের পার্শ্বে বসিয়া বলিতেছেন:—

"এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥"

আজ আর রাধার কোন অভাব নাই; তাহার শেষে নিবেদন—আত্ম নিবেদন

"বধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে   জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥"

পাঠক! প্রেমিকার এরূপ আত্ম নিবেদন অন্য কোথাও শুনিয়াছেন কি? প্রেমের এমন অপরূপ ভাব দেখিয়াছেন কি? চণ্ডীর কবিতা বুঝাইবার নহে—বুঝিবার—হৃদয়ে অনুভব করিবার সামগ্রী। ভাব সম্মিলনের পরে।

মহারাস।

চণ্ডীদাস রাসলীলার বর্ণনায় সর্ব্বত্র ভাগবতের অনুসরণ করেন নাই, স্থানে স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রাসলীলায় চণ্ডীদাসের কল্পনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শারদ পূর্ণিমা মধুর সুগন্ধি মলয় বাতাস নাচিয়া নাচিয়া বৃক্ষশিরের সহিত খেলা করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে, ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে অধীর হইয়া পেখম তুলিয়া নাচিতেছে, সরস প্রকৃতি দেবী যেন প্রেমে মত্ত হইয়া আপনিই নৃত্য করিতেছেন। এ হেন মধুর উজ্জ্বল রাত্রিতে রত্নবেদিকায় উপবেশন

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তিনি বংশী-বাদন করিলেন। মধুর বংশীধ্বনি যমুনাতট হইতে সৃষ্ট হইয়া ব্রজভূমে প্রবেশ করিল। ব্রজগোপীদের

"শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকত বাজিছে বাশী।"

বংশী শ্রবণে

"বরজ তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥"

গোপীগণ সব ভুলিলেন; লাজ, মান এমন কি কুলের ভয় পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। কৃষ্ণের মুরলীর মধুর ধ্বনি শ্রবণে গোপবালাগণ তখন

"কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিয়ে
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান॥

কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিদ।
যেমন চোরই হরণ করিল
মানসে কাটিল সিঁদ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥"

মুরলীর সঙ্কেত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজগোপীগণ আকুল হইয়া পড়িলেন; তিলমাত্র বিলম্ব আর সহ্য হয় না। কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ভূমে নিক্ষেপ করিয়া, কেহ রন্ধন ত্যাগ করিয়া, কেহ পতির কোল হইতে উঠিয়া যমুনা পুলিনে বৃন্দাবনে ব্রজেশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ব্রজগোপীগণ এতই আকুলা, এতই ধৈর্য্যহীনা, এতই উন্মত্তা যে

"রসের আবেশে পদ আভরণ
কেহ বা পরিল গলে।
গলা আভরণ কোন ব্রজরামা
পরিছে চরণে ভালে॥
বাহুর ভূষণ কনক-কঙ্কণ
পরিল হৃদয় মাঝ।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে॥
কেহ বা পরিল একহি কুণ্ডল
শোভই একহি কাণে।

ঐছন চলল বয়জ রমণী
ধৈরজ নাহিক মানে॥"

বেণুরবে শ্রীরাধিকা ব্রজগোপীসহ বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন :—

"অবলার কুল অতি নিরমল
ছুইতে কুলের নাশ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস॥"

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী বলিলেন :—

"আর কি কুলের ভয়।
এক দিন জাতি কুল শীল পাঁতি
দিয়াছি ও দু'টী পায়॥
আর কি কুলের গৌরব সূচনা
আর কি জেতের ডর।
তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এখন কি কর ছল॥"

শ্রীরাধা সহ ব্রজগোপীরা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। অবশেষে মানভরে শ্রীমতী

"মাধবী তলাতে বসি এক ভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।"

এদিকে মাধবী তলায় শ্রীমতী মানভরে আছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বড়ই কাতর হইলেন। তিনি প্রথমে

"মান ভাঙ্গাইতে পূরিল মুরলী
রাধার না ঘুচে মান।"

কিন্তু কোন ফল হইল না। তার পর দুতী পাঠাইলেন, তাহাতেও রাধার মান ভাঙ্গিল না। শ্রীকৃষ্ণ বড় বিপদে পড়িলেন। অবশেষে সখীর উপদেশে স্ত্রীবেশে রাধা সমীপে গমন করিয়া মান ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রাধার মান ভাঙ্গিবার জন্য

"বাঁধল কুন্তল লোটন সুন্দর
বেড়িয়া মালতীদাম।
তাহার পাশেতে মুকুতার মালা
শোভে অতি অনুপাম॥
নানা আভরণ কঙ্কণ-ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কিনী জাল।
নীল বসনের ওড়নি সুন্দর
করে বীণা চন্দ্র ভাল॥"

শ্রীকৃষ্ণ বীণা হস্তে মাধবী তলায় উপস্থিত হইলেন। পূরবী, সিন্ধুড়া শ্যামনট, কানড়া, পাহিড়া, দীপক, সুরটমল্লার প্রভৃতি রাগ আলাপ করিলেন। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে শ্রীরাধার মান ভাঙ্গিল,—আত্ম-বিস্মৃতা রাধা ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন—যুগলমিলন হইল। তখন

"যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দোঁহার গায়।
কোন কোন জন শ্রীঅঙ্গ চাহিয়া
করিছে পাখার বায়॥
কোন কোন জনে গাঁথি ফুল দামে
দিয়াছে শ্যামের গলে।

কোন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে\
চামর ঢুলায় ভাল॥”

তারপর শ্রীমতী বংশী বাদন শিক্ষা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ধড়া চূড়া পরিধান করিয়া শ্রীমতী বাঁশী বাজাইলেন। বাঁশী “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া উঠিল। তারপর একরঙ্গে দু’জনে একসঙ্গে বাজাইলেন। বাঁশী “রাধাকৃষ্ণ” বলিয়া বাজিয়া উঠিল। মুরলীর স্বরে

“যমুনা উজান ধরে
খগ মৃগ পাখী দুসারি কাননে
বাঁশীটি শুনিয়া ঝুরে॥”

তারপর রাই রাজা। ব্রজগোপীরা ধরিয়া বসিল

“এই বৃন্দাবনে রতন আসনে
রাধারে করিব রাজা।
* * * *
সবার মাঝারে ছত্র দণ্ড দিব
ধরিয়া আড়ানি মাথে।”

তারপর গোপীরা পদ্ম, চাঁপা, নাগেশ্বর, মল্লিকা, মাধবী, চম্পক, কেতকী ও চামেলী ফুল তুলিয়া আনিলেন ও সুবাসিত তৈল সহ হরিদ্রা মাখাইয়া রাধাকে সহস্র ধারার জলে স্নান করান হইল। অভিষেকান্তে মাথায় “বিনোদ পাগড়ি” দিয়া রাধাকে রত্নসিংহাসনে বসান হইল। আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সহর কোটাল। শ্রীমতী বৃন্দাবনের বনে নব নগর পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। নগর পরিদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বামে বসিলেন—আশা পূর্ণ হইল, ব্রজগোপীরা প্রাণ

ভরিয়া যুগলরূপ দেখিলেন। তারপর কুঞ্জর লীলা একশত রমণী কুঞ্জর-রূপ ধারণ করিয়া রাধাকৃষ্ণকে লইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ লীলা করিতে করিতে গোপীরা আনন্দে অধীরা হইলেন; ফলে আত্মবিস্মৃতি ঘটিল—মনে অহঙ্কারের উদয় হইল। এক গোপী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

"শুন গুণমণি কহি একবাণী
কাঁধেতে করহ মোরে।
তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে
নিশ্চয় কহিয়ে তোরে॥"

গোপী যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে উঠিতে যাইবেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। তারপর অদর্শনে গোপীদের বিলাপ বড়ই মধুর গোপীরা স্থির করিলেন

"যাইয়া যমুনা কূলে।
সব গোপীগণ হেন কৈল মন
ঝাঁপ দিতে সেই জলে॥"

এমন সময়ে

"আসি দেখা দিল সেই সে নাগর
বচন মধুর কয়ে॥"

তারপর গোপীগণ অনেক কথা বলিলেন—শেষে যুগলমিলন। এইরূপ আনন্দে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। অবশেষে সুখনিশি অবসানে ঊষারাণী কনক বসনে সাজিয়া, বালারুণ সিন্দুরের বিন্দু সীমন্তে পরিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে দেখা দিবার সময়

কুঞ্জ ভঙ্গ

হইল।

"প্রভাত কালের কাক, কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর ভুরিতে গেল যে
বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ॥"

উপরোক্ত বিভাগ ছাড়া চণ্ডীদাসের আরও কতকগুলি গান আছে। সেগুলি

রাগাত্মিকা পদ।

এই পদগুলিতে তিনি তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের মধ্যে এই পদগুলির আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এ অধ্যায়ে তাহাতে বিরত থাকিলাম।

স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গবাসী চণ্ডীর এই অমৃত সদৃশ কবিতা-বলী আনন্দের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন। সুন্দর—অতুল—মধুর—বাঙ্গালীর চির প্রাণের পরিচিত—চণ্ডীদাস বঙ্গ গগনে প্রলয়ান্ত-কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবেন *।

* "Sweet Chandi Dass the earliest star in the firmament of Bengali literature Long, long will your strains be remembered and Sung in Bengal." Literature of Be ᵗ.

R. C Dutt

লেখকের অন্য গ্রন্থ

বৈদ্যনাথ-কথা।

(তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।)

মূল্য ॥০ আনা।

বৈদ্যনাথ-কথা একাধারে

ধর্ম্ম—সাহিত্য—ইতিহাস।

মাত্র ১০০ পুস্তক অবশিষ্ট আছে।

বৈদ্যনাথ-কথা সম্বন্ধে দেশের ও দশের মত।

অমৃত বাজার :—"* * * এই পুস্তক বৈদ্যনাথের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং অতীব চিত্তাকর্ষক।

বসুমতী :—"* * * গ্যারিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্যাড্‌লিবার্ট প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব বিশারদদিগের সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট ও সমালোচিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানে লেখক কোথাও "গতানুগতিকের ন্যায়" কাহারও মতানুবর্ত্তন করেন নাই। বস্তু দর্শনে নিজে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা ঐ সকল মহাত্মাদিগের মতের বিরোধী হইলেও অকুণ্ঠ কণ্ঠে বিবৃত করিয়াছেন। * * *।"

নায়ক :—'* * * পুরাণ এবং ইতিহাসের সামঞ্জস্য বড় সহজ-সাধ্য নয়। "বৈদ্যনাথ-কথায়" অতি নিপুণতার সহিত এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। * * * যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে সে

উদ্দেশ্য অতীব মহৎ। 'আমরা গ্রন্থকারের ভূয়সী সিদ্ধি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।"

হিতবাদী ঃ—"* * * এই পুস্তকে দেওঘরের অনেক কথা * * আছে।"

প্রবাসী ঃ—"* * ভাষা প্রাঞ্জল। * * * সাধারণ পাঠকেও ইহার মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় পাইতে পারিবেন।

নব্যভারত ঃ—"* * * বৈদ্যনাথ তীর্থের যাবতঃ জ্ঞাতব্য কথার বিবৃতি। সুলিখিত।

সম্মিলনী ঃ—"* * * প্রত্নতত্ত্বের হিসাবেও পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের সমাদরের সামগ্রী হইয়াছে। * * * বাঙ্গালা পাঠকবর্গের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।"

কায়স্থ পত্রিকা ঃ—"* * * আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তীর্থ মাহাত্ম্য বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই" **

আর্য্য সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ঃ—"* * * আপনি সাধারণের মনে উচ্চধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন ইহা অকুতোভয়ে বলিতে পারি। * * *।"

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—

মজুমদার, সিংহ এণ্ড কোং

বৈদ্যনাথ—দেওঘর।